অদ্ভুতুড়ে সিরিজ
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
পটাশগড়ের জঙ্গলে

পটাশগড়ের জঙ্গলে

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ: সুব্রত চৌধুরী

“রা-স্বা”
তানিয়া ও রেশমীকে

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

অঘোরগঞ্জের ঘোরালো ব্যাপার
অষ্টপুরের বৃত্তান্ত
আসমানির চর
উঁহু
কিশোর উপন্যাস সমগ্র (১-৪)
কুঞ্জপুকুরের কাণ্ড
গজাননের কৌটো
গোঁসাইবাগানের ভূত
গোলমেলে লোক
গৌরের কবচ
চক্রপুরের চক্করে
ছায়াময়
জং বাহাদুর সিংহর নাতি
ঝিকরগাছায় ঝঞ্ঝাট
ঝিলের ধারে বাড়ি
ডাকাতের ভাইপো
দশটি কিশোর উপন্যাস
দুধসায়রের দ্বীপ
নন্দীবাড়ির শাঁখ
নবাবগঞ্জের আগন্তুক
নবীগঞ্জের দৈত্য
নৃসিংহ রহস্য
পাগলা-সাহেবের কবর
পাতালঘর
বক্সার রতন
বটুকবুড়োর চশমা
বনি
বিপিনবাবুর বিপদ
ভুতুড়ে ঘড়ি
ভোলু যখন রাজা হল
মদন তপাদারের বাক্স
মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি
মোহন রায়ের বাঁশি
রাঘববাবুর বাড়ি
ষোলো নম্বর
ফটিক ঘোষ
সর্বনেশে ভুল অঙ্ক
সাধুবাবার লাঠি
সোনার মেডেল
হাবু ভুঁইমালির পুতুল
হিরের আংটি
হেতমগড়ের গুপ্তধন

জয়পতাকাবাবুকে দেখে কিন্তু মোটেই বীর বলে মনে হয় না। তিনি ভজুরাম মেমোরিয়াল স্কুলের নামকরা অঙ্কের মাস্টারমশাই। কোঁচানো ধুতি, ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি, চোখে গোল রোল্ডগোল্ড ফ্রেমের চশমা, মাথার মাঝখানে চেরা সিঁথি, পায়ে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সবসময়ে সাদা মোজা আর পাম্পশু। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি নয়। কিন্তু গাম্ভীর্য, পোশাক আর চালচলনে প্রবীণের মতো দেখায়। ছেলেরা তাঁকে ভয় খায় বটে, কিন্তু বীর বলে মনে করে না।

সেবার ভজুরাম মেমোরিয়ালের সঙ্গে কালীতলা স্কুলের ফুটবল ম্যাচ। দুটোই নাম-করা টিম। সুতরাং মর্যাদার লড়াই। মাঠে কাতারে-কাতারে লোক জড়ো হয়েছে খেলা দেখতে। খেলা শুরু হয়-হয়। ঠিক এই সময়ে বিপত্তিটা ঘটল।

শহরের সবচেয়ে সাঙ্ঘাতিক জীবটির নাম হচ্ছে কালু। যে হল শিবের ষাঁড়। গায়ে-গতরে যেমন বিশাল, তেমনি তার গোঁ আর রাগ। খেপলে সে আরবি ঘোড়ার মতো দৌড়ায়।

ঘোষবাড়ির ভুতু হচ্ছে এ-শহরের সবচেয়ে বিচ্ছু ছেলে। ভজুরাম মেমোরিয়ালের ক্লাস এইটের ছাত্র। ফুটবল টিমে তার ঢোকা অনিবার্য ছিল। কিন্তু হেডসারের ইংরেজি ক্লাসের সময় সে সারের টেবিলের নিচে একটা জ্যান্ত কাঁকড়া বিছে ছেড়ে দেওয়ার অপরাধে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। খেলা তো বন্ধই, স্কুল থেকে তাড়িয়েও দেওয়া হতে পারে।

ভুতু খেলার দিন একটা পাকা কাঁঠাল জোগাড় করে সোজা বাজরের রাস্তায় কালুকে গিয়ে ধরল। কালু বটতলায় বসে ঝিমোচ্ছিল, কাঁঠালের মনমাতানো গন্ধে চনমন করে উঠল। ভুতু একটি একটি করে কাঁঠালের কোয়া নিজে হাতে কালুকে খাওয়াতে খাওয়াতে খেলার মাঠের দিকে হাঁটতে লাগল। কাঁঠালের সম্মোহনে কালুও তার পিছু-পিছু যাচ্ছে।

খেলার মাঠে সাঙ্ঘাতিক ভিড়। চেঁচামেচিও বেশ হচ্ছে। কাঁঠাল খাওয়ানো শেষ করে ভুতু কালুর লেজ ধরে পেল্লায় এক মোচড় দিয়ে বলল, "যাঃ, কালু যাঃ, লেগে পড়। সব লণ্ডভণ্ড করে দে।"

কালু লেজের মোচড় পছন্দ করে না। সে ফোঁস করে একটা শ্বাস ছেড়ে বাঘের মতো গর্জন করল। আর তখন, কাঁঠালের ভুতিটা তাকে একবার শুঁকিয়ে ভুতু সেটা মাঠের মাঝখানে ছুঁড়ে দিয়েই পালাল।

তারপর আর কাণ্ডটা দেখতে হল না। কালু আর-একটা গর্জন ছেড়ে তীব্র গতিতে ভিড়ের মধ্যে গিয়ে পড়ল। গোটাচারেক লোক শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে ছিটকে পড়ল। তারপর মাঠের মাঝখানে এক রণতাণ্ডব শুরু

করে দিল কালু।

লোকে পড়ি কি মরি করে পালাতে লাগল চারিদিকে। প্লেয়াররা কিছু পালাল, কয়েকজন গোল পোস্টের ওপর উঠে পড়ল। চারদিকে হুড়োহুড়ি হুলুস্থুলু কাণ্ড।

একধারে দুই স্কুলের মাস্টারমশাইরা চেয়ারে বসেছিলেন। মাঝখানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সামনের টেবিলের ওপর ষষ্ঠীচরণ স্মৃতি শিল্ড এবং বগলাপতি রানার্স আপ কাপ সাজানো। কালু মাঠে নামতেই মাস্টারমশাইরা উঠে দুড়দাড় পালালেন। ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব চেঁচিয়ে পুলিশদের ডাকাডাকি করছিলেন। কেউ অবশ্য এগিয়ে এল না। এখানকার পুলিশদের ধারণা, কালু শিবের সাক্ষাৎ বাহন, তার গায়ে গুলিও লাগবে না। উপরন্তু শিবের কোপে নির্বংশ হতে হবে।

ঠিক এই সময়ে দেখা গেল, জয়পতাকাবাবু বীরদর্পে উঠে দাঁড়িয়েছেন। একটা লাল সালুতে 'ষষ্ঠীচরণ স্মৃতি শিল্ড' লেখা। যেটা প্যান্ডেলের মাথায় টাঙানো ছিল। একটা চেয়ারে উঠে সালুটা খুলে ফেললেন জয়পতাকাবাবু। তারপর সোজা মাঠে নেমে কালুর মুখোমুখি হলেন।

কালু এমনিতেই রাগী। এত লোক দেখে তার মাথা আরও গরম হয়েছে। তার ওপর ভিড়ের মধ্যে সে কাঁঠালের ভুতিটাও খুঁজে পায়নি। তার চোখ লাল, মুখে ফেনা, গলা দিয়ে ঠিক বাঘা গর্জন বেরোচ্ছে। ঠিক এই সময়ে ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা জয়পতাকাবাবুকে সে দেখতে পেল। একেবারে মুখোমুখি। এবং দেখল, তাঁর হাতে লাল সালু।

লাল দেখে আর মাথার ঠিক রাখতে পারল না কালু। সব ভুলে সে তেড়ে এল জয়পতাকাবাবুর দিকে।

কিন্তু অকুতোভয় জয়পতাকা স্যার স্পেনদেশীয় বুল-ফাইটারদের মতোই অনায়াস দক্ষতায় সালুটা একটু পাশ কাটিয়ে ধরলেন। কালু তেড়ে আসতেই চট করে সরিয়ে নিলেন। দিগভ্রান্ত কালু খানিকটা দৌড়ে গিয়ে ভুল বুঝতে পেরে ফিরল। এবং আবার মাথা নিচু করে শিং উচিয়ে তেড়ে এল।

ডাকাবুকো জয়পতাকাবাবু আবার কালুকে দিগভ্রান্ত করে দিলেন।

এই কাণ্ড দেখে পলাতক লোকজনেরা আবার ফিরে আসতে লাগল। চারদিকে করতালি ও হর্ষধ্বনিও শোনা যেতে লাগল। এর ফলে জয়পতাকাবাবু খুবই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। লোকে ফুটবল খেলা ছেড়ে তাঁর সঙ্গে ষাঁড়ের লড়াই দেখছে, এটা কম কথা নয়। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে কালুর সম্মুখীন হলেন এবং আবার কালুকে লাল সালু দিয়ে একেবারে বোকা বানিয়ে ছাড়লেন।

বারবার তিনবার, জয়পতাকাবাবু রীতিমত চনমনে হয়ে উঠেছেন। বেঁচে থাকার একটা আলাদা স্বাদ পাচ্ছেন। অঙ্ক কষাতে বা ছেলেদের পড়াতে তিনি দারুণ আনন্দ পান, কিন্তু এ-আনন্দ সেই আনন্দের চেয়েও যেন বেশি।

কালু দিগভ্রান্ত হয়ে গোলপোস্ট বরাবর চলে গিয়ে থেমেছে, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সামনের দু'পায়ের খুর দিয়ে ক্রুদ্ধ ও ভয়াল ভঙ্গিতে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে, মুখে ফেনা তুলে একটা রণহুঙ্কার দিয়ে তেড়ে আসতে শুরু করেছে।

এদিকে জয়পতাকাবাবুও তৈরি। কিন্তু মুশকিল হয়েছে তাঁর পরনে মাটাডোরের পোশাক নেই। তিনি পরেছেন নিরীহ বাঙালির ঢিলেঢালা পোশাক ধুতি আর পাঞ্জাবি। পায়ের পাম্পশুটাও ষাঁড়ের লড়াইয়ের উপযুক্ত জুতো নয়। ফলে হল কি, তাঁর কাছা খুলে গেল, একপাটি জুতো হল নিরুদ্দেশ।

অকুতোভয় জয়পতাকাবাবু এক হাতে কাছা গুঁজতে গুঁজতে অন্য হাতেই লাল সালু নাড়তে নাড়তে কালুর মুখোমুখি হলেন। আশ্চর্যের বিষয়, এবারও কালু জয়পতাকা-সারকে ছুঁতে পারল না দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

চতুর্দিক থেকে সবাই কালুকে দুয়ো দিল, জয়পতাকা-সারকে জানাল অভিনন্দন।

জয়পতাকাবাবু হঠাৎ বুঝতে পারলেন, তাড়াহুড়োয় তিনি কাছাটা গুঁজেছেন পাঞ্জাবিসমেত। ফলে পাঞ্জাবি গায়ে টাইট হয়ে তাঁকে সামনে ঝুঁকতে দিচ্ছে না। একপায়ে জুতো না থাকাতে শরীরের ভারসাম্য রাখাও কঠিন হয়েছে।

কালু যখন পঞ্চমবার তাঁকে ক্রোধোন্মত্ত আক্রমণ করতে তৈরি হচ্ছে তখনও জয়পতাকাবাবু রণে ভঙ্গে দিলেন না। অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে জামাটা টেনে বের করে কাছাটা ঠিকমতো আঁটতে গেলেন।

কালু তেড়ে এল। বিভীষণ বেগেই এল। জয়পতাকাবাবু সালুটা নাড়বার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু তাড়াহুড়োয় এবার কাছার সঙ্গে সালুটা গুঁজে ফেলায় ভারী মুশকিল হল। সালুটা পিছনে গোঁজা থাকায় জয়পতাকাবাবুকে কালুর দিকে পিছন ফিরে সালুটা নাড়তে হচ্ছিল। কালু সোজা এসে গদাম করে গুঁতিয়ে দিল জয়পতাকাবাবুকে।

সবাই হায়-হায় করে উঠল। অঙ্কের এমন মাস্টার যে সাতটা শহর খুঁজলেও মিলবে না। গেল, অমন একজন মাস্টার ষাঁড়ের গুঁতোয় শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু দিনটা আজ কালুর নয়। আজ জয়পতাকাবাবুরই ছিল।

কালু গুঁতো মারল ঠিকই, কিন্তু সঠিক ক্যালকুলেশন করে মারেনি। গুঁতোটা যদিও জয়পতাকাবাবুকে শূন্যে তুলে ফেলল, এমনকি তিনি শূন্যে দুটো সামারসল্টও খেলেন, কিন্তু কালুর শেষরক্ষা হল না। ঝড়ের বেগে গুঁতিয়ে যখন শাঁ করে কালু বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন দেখা গেল, শূন্যে ওই ডিগবাজি খেয়েও জয়পতাকা-সার নির্ভুলভাবে কালুর পিঠে সওয়ার হয়ে গেছেন। ঠিক ঘোড়সওয়ারের মতোই। তেমনি বুক ফোলানো দৃপ্ত ভঙ্গি। মেরুদণ্ড সোজা রেখে উপবিষ্ট। হাতে অবশ্য চাবুকের বদলে লাল সালু।

কালুর জীবনেও এই অভিজ্ঞতা প্রথম। এই মফস্বল শহরে সবাই তাকে দারুণ ভয় খায়। কেউ তাকে ঘাঁটায় না, মুখখামুখি লাল কাপড় দেখানো তো দূরস্থান। কিন্তু এই একটা লোক, শুধু তাকে খেপিয়েই তোলেনি, আবার নির্লজ্জের মতো পিঠের ওপরে বসেও আছে!

কালু আর ফিরল না। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কালুর মতো ভয়ঙ্কর ষাঁড়ের এরকম লেজে-গোবরে হওয়া দেখে দর্শকমণ্ডলী তুমুল হর্ষধ্বনি দিয়ে উঠল। গণ্ডগোল থামলে ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব সকলকে উদ্দেশ করে গদগদ স্বরে বললেন, "পৃথিবীতে মানুষই যে শ্রেষ্ঠ জীব তা আজ আর-একবার প্রমাণিত হল। পশুশক্তি যে মানুষের কাছে চিরকালই পরাজিত হয়ে আসছে তার কারণ মানুষের প্রকৃত শক্তি হচ্ছে মনুষ্যত্ব, তার বীরত্বে। আজ সার্থকনামা জয়পতাকাবাবু মানুষের জয়পতাকাই আবার ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। ভীরু বাঙালি দুর্বল বাঙালির ভিতরেই লুকিয়ে আছে দুর্জয় বাঙালি। স্পেনদেশীয় বিখ্যাত মাটাডোরদের চেয়ে বাঙালি যে কোনও অংশে কম নয়, তা আবার প্রমাণিত হল। কে বলে বাঙালি হীন? বিজয়সিংহ লঙ্কা জয় করেননি? রবীন্দ্রনাথ নোবেল পাননি? স্বামী বিবকোনন্দ আমেরিকায় ঝড়

তোলেননি? গোষ্ঠ পাল কি সাহেবদের পা-কে রেয়াত করেছেন? সুভাষ বোস বার্মা ফ্রন্টে ইংরেজদের তুলোধোনা করেননি?" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই আবেগপূর্ণ বক্তৃতায় সবাই তুমুল হাততালি ও হর্ষধ্বনি দিল। এরপর নির্বিঘ্নে খেলাও শুরু হয়ে গেল।

শুধু হেডসার শুকনো মুখে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডসারের কানে-কানে বললেন, "জয়পতাকাবাবুকে কালু কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলল সেটা একটু খোঁজ করা দরকার। আপনি কয়কেটা ছেলেকে চারদিকে পাঠিয়ে দিন।"

কিন্তু মুশকিল হল, ছেলেরা সব সন্ধেবেলা ফিরে এসে হেডসারকে বলল, কালু বা জয়পতাকাবাবুকে শহরের কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। তবে দৃশ্যটা অনেকেই দেখেছে, কালু তীরবেগে রাস্তা ধরে দৌড়ে যাচ্ছে, তার পিঠে অবিচল জয়পতাকাবাবু বসা। হাতে লাল সালু পতাকার মতো উড়ছে। দৃশ্যটা যারা দেখেছে তারাও বুঝতে পারছে না, ভুল দেখেছে কি না।

খবরটা যখন জয়পতাকাবাবুর বাড়িতে পৌঁছল তখন জয়পতাকাবাবুর দাদু জয়ধ্বনি রায় এবং বাবা জয়োল্লাস রায় হাঁ। জয়পতাকা কালুকে টিট করেছে এটা তাঁদের বিশ্বাসই হল না।

জয়ধ্বনি বললেন, "যদি এরকম একটা বীরের কাজ জয়পতাকা করেই থাকে, তা হলে ওকে আমি সোনার মেডেল দেব।"

জয়োল্লাসবাবুও বললেন, "আমি কাঁঠাল খেতে বড় ভালবাসি। কিন্তু কালুর ভয়ে বাজার থেকে কাঁঠাল কিনে আনতে ভরসা হয় না। একদিন পাকা কাঁঠালের গন্ধ পেয়ে আমাকে এমন তাড়া করেছিল যে, আর

কহতব্য নয়। কালুকে যদি জয়পতাকা দেশছাড়া করেই থাকে, তবে হরির লুট দেওয়া উচিত।”

ওদিকে সন্ধেবেলা স্কুলেও মিটিং চলছে। জয়পতাকাবাবুর বীরত্বে ভজুরাম স্কুলের সকলেই গর্বিত। ম্যাচে তারা দু’গোলে হারা সত্ত্বেও ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব জয়পতাকাবাবুর সম্মানে আগামীকাল স্কুল ছুটি দিতে অনুরোধ করায় হেডমাস্টারমশাই ছুটি দিয়েও দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর মুখ শুকনো। কালু জয়পতাকাকে কোথায় নিয়ে গেল?

ঘটনার সময় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ব্যস্তবাগীশ ব্যোমকেশবাবু শহরে ছিলেন না। নিখিল জগদীশপুর মাছধরা প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে গিয়েছিলেন ঈশানগঞ্জ গণ-শৌচাগারের উদ্বোধন করতে। শহরে ফিরে খবরটা পেয়েই একটা রিকশা নিয়ে স্কুলে এসে হাজির।

“এই যে বিষ্টুবাবু, এ সব কী শুনছি? এ তো সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড মশাই। সেই যে বাঘা যতীন হাত দিয়ে বাঘ মেরেছিলেন তারপর থেকে ইনফ্যাক্ট বাঙালির তো আর তেমন বীরত্বের রেকের্ড নেই? অ্যাঁ, কী বলেন? ইনফ্যাক্ট আমি তো ভাবছি জয়পরাজয়বাবুকে একটা নাগরিক সংবর্ধনা দেব।”

হেডসার বিষ্ণুবাবু সসম্ভ্রমে বললেন, “দেওয়াই উচিত।”

“ম্যাজিস্ট্রেটসাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি তো জয়পরাজয়বাবুর গুণগানে পঞ্চমুখ। ইনফ্যাক্ট শহরের জগগণও একই কথা বলছে। অ্যাঁ, কী বলেন? তবে, হ্যাঁ, ইনফ্যাক্ট বিরূপ প্রতিক্রিয়াও যে নেই, তাও বলা যায় না। ইনফ্যাক্ট অনেকে তো খুবই চটে গেছে। তাদের বিশ্বাস, কাল হচ্ছে স্বয়ং শিবের প্রতিনিধি, তাকে জনগণের সামনে হেনস্থা করা খুবই অন্যায় হয়েছে। আর যার পিঠে চেপে স্বয়ং শিব ঘুরে বেড়ান, তার পিঠে চাপাটাও জয়পরাজয়বাবুর ঠিক হয়নি।”

বিষ্ণুবাবু সসম্ভ্রমে বললেন, “ওঁর নাম জয়পতাকা, জয়পরাজয় নয়।”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ ভুল হয়েছিল। নাগরিক সংবর্ধনটা ওঁকে দেওয়াই স্থির করে ফেলি তা হলে! অ্যাঁ, কী বলেন! অবশ্য ইনফ্যাক্ট একইসঙ্গে একটা ধিক্কার সভাও হবে। অনেকে তো সমবেতভাবে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করবে, ইন ফ্যাক্ট আমাকে দুটো সভারই সভাপতি হতে হবে। আফটার অল সকলেই তো ভোটার, আমাকে সকলের দিকই দেখতে হয়।”

বিষ্ণুবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “তা তো বটেই।”

ব্যোমকেশবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন, “একইদিনে শহরের দু’জায়গায় জয়পরাজয়বাবুর নিন্দা এবং প্রশংসা—এ বেশ ভালই হবে। প্রশংসা করতে গিয়ে তো লোকের মাত্রাজ্ঞান থাকে না, বেশি বেশি বলে ফেলে। নিন্দা করতে গিয়েও ইনফ্যাক্ট তাই-ই হয়। এই একসেস ব্যাপারটা নিন্দা ও প্রশংসায় কাটাকাটি হয়ে যাবে। অ্যাঁ, কী বলেন? তা জয়পরাজয়বাবুকে একটু ডাকুন, আমি ওঁকে একটু অভিনন্দন জানিয়ে যাই।”

বিষ্ণুবাবু দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বললেন, “কালু আর জয়পতাকা কারওই তো কোনও খোঁজ নেই।”

ব্যোমকেশবাবু চমকে উঠে বললেন, “অ্যাঁ, সে কী!”

“সব জায়গায় ছেলেরা খুঁজে এসেছে। কালুও নেই, জয়পতাকাও নেই। জয়পতাকাকে না পেলে স্কুল চলবে কী করে ভেবে পাচ্ছি না। সে আমাদের অঙ্কের জাদুকর, গাধা পিটিয়ে মানুষ করে।”

ব্যোমকেশবাবুকে খুবই চিন্তিত দেখাল। অনকেক্ষণ ভেবে বললেন, “যদি ধরুন, ইনফ্যাক্ট জয়পরাজয়বাবুকে না-ই পাওয়া যায়, তা হলে কী করবেন?”

"আমরা অতটা ভাবছি না। জয়পতাকা যেখানেই যাক ফিরে আসবেই। ভজুরাম মেমোরিয়াল স্কুলকে সে বড্ড ভালবাসে।"

ব্যোমকেশবাবু চিন্তিতভাবে বললেন, "নাগরিক সংবর্ধনা আর ধিক্কার সভা দুটোই যে পরশুদিন। উনি না এলে তো খুবই মুশকিল, ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরশুদিনও যদি জয়পরাজয়বাবুর খোঁজ না-ই পাওয়া যায়, তা হলে কী করবেন?"

"আমরা অতটা ভাবছি না। জয়পতাকা যেখানেই যাক ফিরে আসবেই। ভজুরাম মেমোরিয়াল স্কুলকে সে বড্ড ভালবাসে।"

ব্যোমকেশবাবু চিন্তিতভাবে বললেন, "নাগরিক সংবর্ধনা আর ধিক্কার সভা দুটোই যে পরশুদিন। উনি না এলে তো খুবই মুশকিল, ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরশুদিনও যদি জয়পরাজয়বাবুর খোঁজ না-ই পাওয়া যায়, তা হলে কী করবেন?"

"আমরা অতটা ভাবছি না। জয়পতাকা যেখানেই যাক ফিরে আসবেই। ভজুরাম মেমোরিয়াল স্কুলকে সে বড্ড ভালবাসে।"

ব্যোমকেশবাবু চিন্তিতভাবে বললেন, "নাগরিক সংবর্ধনা আর ধিক্কার সভা দুটোই যে পরশুদিন। উনি না এলে তো খুবই মুশকিল, ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরশুদিনও যদি জয়পরাজয়বাবুর খোঁজ পাওয়া না যায় তা হলে..."

"তা হলে আমাদের মুরারীবাবুই অঙ্ক করাবেন। কিন্তু উনি বুড়ো হয়েছেন..."

ব্যোমকেশবাবু গম্ভীর মুখে বললেন, "পরশুদিনও জয়পরাজয়বাবু না ফিরলে আমরা নাগরিক সংবর্ধনাটাকে শোকসভা করে দেব। অ্যাঁ, কী বলেন? ধরেই নিতে হবে যে, ইনফ্যাক্ট উনি মারাই গেছেন। কিলড বাই কাল।"

সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেই ব্যোমকেশবাবু তড়িৎ-পায়ে বেরিয়ে গিয়ে রিকশায় চাপলেন। তাঁর মেলা কাজ। আজ রাতে একটা ব্রিজখেলা প্রতিযোগিতা, একটা ব্যায়াম প্রতিযোগিতা, একটা গানের জলসা উদ্বোধন করতে হবে। পকেট থেকে একটা ছোট্ট নোটবই বের করে এনগেজমেন্টগুলো দেখে নিয়ে আপনমনে বললেন, "উঃ কত কাজ! সকলের মুখেই কেবল ব্যোমকেশ আর ব্যোমকেশ। ব্যোমকেশ ছাড়া কারও চলে না। হুঁ হুঁ বাবা, শ্যাম লাহিড়ীকে আর কলকে পেতে হচ্ছে না।"
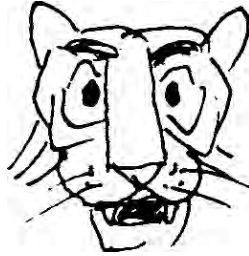
ওদিকে জয়পতাকাবাবুর কী হল সেটাও একটু দেখা দরকার।

একথা ঠিক যে, তিনি কালুকে নিরস্ত করতে গিয়ে প্রচণ্ড সাহস ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি যে স্পেনদেশে জন্মগ্রহণ করলে একজন প্রথম শ্রেণীর বুল ফাইটার হতে পারতেন, সে-বিষয়েও আর

সন্দেহ থাকার কথা নয়। কালুকে তিনি নিরস্ত ও পরাস্ত করেও একেবারে শেষরক্ষাটা হয়নি। লড়াইয়ের শেষ পর্যায়ে কালু তাঁকে ঢুঁ মেরে শূন্যে নিক্ষেপ করে এবং তিনি শূন্যে পুরোপুরি দুটো ডিগবাজি খান। এর পরের দৃশ্য যদিও জয়পতাকাবাবুর জয়ই ঘোষণা করে। দেখা যায় তিনি কালুর পিঠে সওয়ার হয়ে বসে আছেন এবং কালু ভীত ও বিস্মিত হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য ছুটছে।

দৃশ্যটা ভাল হলেও জয়পতাকাবাবুর কিন্তু এতে কোনও কৃতিত্ব নেই। কারণ শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে কালুর পিঠে সওয়ার হওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তাঁর ছিল না। নেহাতই দৈবক্রমে তিনি কালুর পিঠের ওপর এসে পড়েন। কিন্তু লোকে তা জানে না। লোকে এও জানে না যে, কালুর গুঁতোয় জয়পতাকাবাবুর মাথায় এমনই এক সাঙ্ঘাতিক ঝাঁকুনি লাগে, যার ফলে তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে যায় এবং তিনি স্মৃতিভ্রংশ হয়ে পড়েন।

কালু যখন তাঁকে পিঠে নিয়ে ছুটছে, তখন জয়পতাকাবাবু বুঝতে পারছেন না ব্যাপারটা কী হচ্ছে। তবে তিনি বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে পড়লেও স্বাভাবিক জৈব তাড়নায় ছুটন্ত কালুর পিঠ থেকে নামবার চেষ্টা করলেন না। বরং খুব আঁট হয়ে বসে রইলেন। বসে-বসে তিনি চারিদিকের ছুটন্ত বাড়িঘর এবং লোকজন দেখতে লাগলেন। এটা কোন শহর তা তিনি বুঝতে পারছিলেন না, যদিও এই শহরেই তাঁর জন্ম। তিনি যে কে, তাও তিনি বুঝতে পারছিলেন না। পূর্বাপর কোনও ঘটনাই তাঁর মনে পড়ল না। তিনি শুধু বুঝতে পারছিলেন যে, এক বেগবান ষাঁড়ের পিঠে তিনি বসে আছেন। ব্যাপারটা তাঁর কাছে খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছিল। যেন তিনি রোজই ষাঁড়ের পিঠে চেপে ঘুরে বেড়ান। তাই তিনি হাসি-হাসি মুখ করেই বসে রইলেন। শুধু তাই নয়, রাস্তার দু'ধারে দাঁড়ানো যেসব লোক বিস্ময়ে এবং আতঙ্কে দৃশ্যটা দেখছিল, তাদের উদ্দেশে হাত নেড়ে অভিনন্দনও জানাতে লাগলেন।

কালুর জীবনে এরকম অভিজ্ঞতা আর হয়নি। এই শহরে সে ছিল একচ্ছত্র সম্রাট। এই অঞ্চলে আরও কয়েকটা ষাঁড় আছে বটে, কিন্তু তারা কেউ কালুর সমকক্ষ নয়। কালুকে তারা রীতিমত মান্যগণ্য করে, এমনকী নিজেদের ভাষায় হয়তো কাকা-জ্যাঠা বা ওস্তাদ কিংবা মহারাজ বলে ডাকেও। কালুকে খাতির না করেই বা কে? গুঁতোর চোটে সে বহু লোককে টিট করেছে, স্বয়ং দারোগাবাবুকেও ছাড়েনি। এমনকী শ্যাম লাহিড়ীর খুনিয়া ডোবারম্যান কুকুরটা অবধি তাকে পথ ছেড়ে দেয়। কালুর পিঠে যখন একটা মাছিও বসবার আগে দু'বার ভাবে, তখন এ লোকটা যে, কী করে উড়ে এসে জুড়ে বসল সেটাই কালুর মাথায় আসছে না। যতই ভাবছে কালু ততই এই হেনস্থা আর অপমানে আরও মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। আর আতঙ্কিত হয়ে সে ছুটছেও প্রাণপণে। আপদটাকে পিঠ থেকে না সরাতে পারলে তার শান্তি নেই।

ছুটতে ছুটতে কালু শহর পেরিয়ে এল। পথশ্রমে তার মুখ দিয়ে ফেনা উড়তে লাগল। তবু সে থামল না। সে পরিষ্কারই বুঝতে পারছে যে, শহরের অন্যান্য ষাঁড় আর তাকে আগের মতো মান্যগণ্য করছে না, লোকেরাও আর তাকে শিবের বাহন বলে কলটা-মুলোটা ভেট দেবে না। শ্যাম লাহিড়ীর ডোবারম্যান কুকুর এবার তাকে দেখলেই নির্ঘাত ইংরেজিতে ঘেউ ঘেউ করে দুয়ো দেবে। গায়ের জ্বালা জুড়োতে সামনে নদী দেখে কালু তাতে নেমে পড়ল।

নদীতে জল বেশি নেই। কালুর পেটটাও ভিজল না জলে। সে নদী পেরিয়ে ডাঙায় উঠল। সামনে পটাশগড়ের ভয়াবহ জঙ্গল। এই জঙ্গলে ঢুকবার আগেই বাঘের গায়ের গন্ধ পাওয়া যায়। তা ছাড়া আরও কত হিংস্র জানোয়ার আছে। ভালুক, চিতা, গণ্ডার, বুনো শুয়োর, বন্য কুকুর আর মোষ।

পটাশগড়ের আরও নানা বদনাম আছে। তবে কালু সেগুলো জানে না। সে বাঘের গায়ের গন্ধটা অবশ্য ভালই টের পায়। বাঘ হল পশুর জগতে গুণ্ডা বললা গুণ্ডা, মস্তান বলো মস্তান। তাই অতীতে অনকেবার ধারকোছে এলেও কালু পটাশগড়ের জঙ্গলে ঢুকতে সাহস পায়নি। কিন্তু আজ তার মাথার ঠিক নেই। পিঠের বিচ্ছিরি বোঝাটাকে না নামালেই নয়। পটাশগড় ঘন জঙ্গল। লুতায়-পাতায়, গাছপালায় একেবারে নিশ্ছিদ্রই বলা যায়। কোনও একটা ফাঁক দিয়ে একার জঙ্গলে ঢুকতে পারলে ডালপালায় আটকে লোকটা তার পিঠ থেকে পড়বেই।

কালু জানে না, পটাশগড়ের জঙ্গলে শুধু সে কেন, অমন বাঘা শিকারি শ্যাম লাহিড়ী অবধি একেবারের বেশি দু'বার ঢোকেনি। জঙ্গলের ভিতরে ভুতুড়ে জলা, চোরাবালি, গভীর খাদ সবই আছে। আছে জোঁক, সাপ, বিছে, তা ছাড়া আর যা আছে তা নিয়ে লোকে বেশি উচ্চবাচ্য করে না। কিন্তু জায়গাটা সবাই এড়িয়ে চলে। এমনকী কাঠুরে বা পাতাকুড়ুনি বা মউলিরাও বড় একটা এদিকপানে আসে না। এসব জানে না বলেই কালু তার পিঠের অনভিপ্রেত সওয়ারটিকে নিয়ে সবেগে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

জয়পতাকাবাবুর স্মৃতিভ্রংশ হলেও জৈবিক বুদ্ধি লোপ পায়নি। তিনি ঘন ডালপালা দেখেই কালুর পিঠে সটান শুয়ে পড়লেন উপুড় হয়ে। তাতে খুব একটা লাভ হল না। সন্ধের আবছা আঁধার নেমে এসেছে বাইরে। আর জঙ্গলের ভিতরটা ঘুরঘুট্টে অন্ধকার। সবেগে নানা গাছের ডাল হেডসারের বেতের মতো জয়পতাকাবাবুর পিঠে এবং হাতে-পায়ে এসে লাগছিল। তিনি উঃ-আঃ করতে লাগলেন। কালু আরও ভিতরে ঢুকে পড়তে লাগল। সপাং করে পিঠে একটা কচি বাঁশের ডগা লাগতেই জয়পতাকাবাবু 'গেলাম' বলে মাথাটা যেই তুলেছেন, অমনি গদাম করে একটা মোটা গাছের ডাল তাঁর কপালে এসে লাগল। জয়পতাকাবাবু মাটিতে ছিটকে পড়ে গেলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে কে যেন কাছ থেকেই ভারী মোলায়েম গলায় বলে উঠল, "আসুন! আসুন! কী ভাগ্য আমাদের!"

জয়পতাকাবাবু কপালটা চেপে ধরে খানিকক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইলেন, তারপর হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, তিনি জয়পতাকাবাবু।

নামটা মনে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বাদবাকি সবকিছুই সিনেমার ছবির মত তাঁর মনে পড়ে যেতে লাগল। মনে না পড়লেই অবশ্য ভাল ছিল, কারণ তাঁর এও মনে পড়ল যে, এই সেই ভয়াবহ মনুষ্যবর্জিত রহস্যময় পটাশগড়ের জঙ্গল। মনে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর গায়ে কাঁটা দিল ভয়ে। কার গলা একটু আগে শুনলেন তিনি? জয়পতাকাবাবু চারিদিকে তাকাতে লাগলেন। নিশ্চিদ্র অন্ধকারে জোনাকি জ্বলছে। গাছপালায় বাতাসের সরদার শব্দ হচ্ছে। একটা হুতোম প্যাঁচা আর একঝাঁক শেয়ালের ডাক শোনা গেল। একটা কেমন বোঁটকা গন্ধও পাচ্ছেন জয়পতাকাবাবু।

তাঁর ভরসা এই যে, কাছাকাছি মানুষ আছে। একটু আগেই ভারী বিনয়ী আর মোলায়েম একটা মনুষ্যকণ্ঠ তিনি শুনতে পেয়েছেন।

জয়পতাকাবাবু গা'টা ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, "কে? কেউ কি আছেন কাছাকাছি?"

কেউ কোনও জবাব দিল না। তবে চাপা হাসির একটা ভারী ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেলেন জয়পতাকা। গায়ে আবার কাঁটা দিল। যতদূর জানা যায় সাহেবশিকারিরা অবধি এই জঙ্গলকে এড়িয়ে চলত। ডাকাবুকো শ্যাম

লাহিড়ী একবার ঢুকেছিলেন। কী হয়েছিল কে জানে। শ্যাম লাহিড়ী ভারী চাপা স্বভাবের গম্ভীর মানুষ। কাউকে সেই অভিজ্ঞতার কথা বলেননি। তবে নিজে আর কখনও ঢোকেননি এই জঙ্গলে।

জয়পতাকা খানিকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চারিদিকটা অন্ধকারে অনুভব করার চেষ্টা করলেন।

জঙ্গলটা শহরের উত্তর দিকে। সুতরাং তিনি যদি দক্ষিণ দিকে এগোন, তা হলে একসময়ে জঙ্গলের বাইরে গিয়ে পৌঁছতে পারবেন, কিন্তু দিক ঠিক পাবেন কী করে? এই ভয়ঙ্কর অন্ধকারে নিজের হাতের তেলো অবধি দেখা যাচ্ছে না যে! সুতরাং তিনি ঠিক করলেন নাক বরাবর এগিয়ে যাবেন। এক জায়গায় স্থির হয়ে না থেকে এগনোই ভাল। পটাশগড়ের জঙ্গলে রাত কাটানোর কথা ভাবাই যায় না।

জয়পতাকা যেই পা বাড়িয়েছেন অমনি সেই মোলায়েম গলা যেন বলে উঠল, "ঠিকই যাচ্ছেন।"

গলাটা এত ক্ষীণ আর এত দূর থেকে এল যে, সেটা আসলে গলা না মনের ভুল তা বুঝতে পারলেন না জয়পতাকা। তবে তিনিও ভারী বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "আপনি যদি আমাকে একটু সাহায্য করেন তবে ভারী ভাল হয়। বড় বিপদে পড়েছি।"

এ-কথার কেউ জবাব দিল না। জয়পতাকা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে হতাশ হয়ে এগোতে লাগলেন। বন-জঙ্গলে এগনো ভারী শক্ত। পদে পদে বাধা। ঝোপঝাড়, কাঁটাগাছ, লতাপাতা সবই পথ আটকায়। পায়ে লতা জড়িয়ে দু'বার মুখ থুবড়ে পড়লেন জয়পতাকা। তবে নিচে গাছের পাতা আর লম্বা ঘাসের নরম আস্তরণ আছে বলে তেমন ব্যথা পেলেন না। একবার খুব কাছ দিয়ে একটা মস্ত বড় প্রাণী দৌড়ে চলে গেল। দু'বার ক্রুদ্ধ বাঘের গর্জন শুনতে পেলেন দূর থেকে।

বুকটা ভারী ঢিবঢিব করতে লাগল কিন্তু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। আজ বিকেলে যে দুঃসাহসের সঙ্গে উনি খ্যাপা ষাঁড়ের মোকাবিলা করেছেন, সেই সাহসের কিছু তো এখনও অবশিষ্ট আছে। সেই সাহসে ভর করেই জয়পতাকা এগোতে লাগলেন। এগনোর পথে কোনও বাধাই তাঁকে আটকাতে পারছিল না। হঠাৎ খানিকটা স্যাঁতসেঁতে জমি পেলেন পায়ের তলায়। কয়েক পা এগোতে ভচাত্ করে হাঁটু অবধি ডুবে গেল কাদায়। তারপর কোমর অবধি বরফ-ঠাণ্ডা জল। জয়পতাকা পরোয়া না করে শীতে হিহি করে কাঁপতে কাঁপতে গতি বজায় রাখলেন। অবশ্য এটা ঠিক শীতকাল নয়। শরৎকাল। তবু এইসব পাহাড়ি অঞ্চলে একটু ঠাণ্ডাই পড়ে যায় এসময়ে। জয়পতাকা শীত প্লাস ভয় প্লাস উৎকণ্ঠাতেও কাঁপছেন। হঠাৎ সামনে ভুশ করে একটা নীলচে আলো লাফিয়ে উঠল শূন্যে। ভুতুড়ে লণ্ঠনের মতো কিছুক্ষণ নিরালম্ব হয়ে দুলতে লাগল। তারপর নিবে গেল। ফের একটু দূরে আর-একটা আলো লাফিয়ে উঠল। অন্য কেউ হলে এই কাণ্ড দেখে চেঁচাত। জয়পতাকা আলেয়ার কথা জানেন। তাই চেঁচালেন না। যদিও প্রথম আলেয়াটা দেখে তাঁর চেঁচাতে ইচ্ছে হয়েছিল।

জলা পার হতেই অনকেক্ষণ সময় লাগল। জয়পতাকা যেন পরিশ্রান্ত বোধ করছেন। জলা থেকে ডাঙায় উঠে একটু জিরিয়ে নেবেন কি না ভাবছেন, এমন সময় সেই মোলায়েম কণ্ঠস্বর বাতাসের ফিরফিসানির মতো বলে উঠল, "এখন যে নষ্ট করার মতো সময় নেই। সাহেবের ডিনারের সময় হয়ে এল।"

কথাটার মানে কিছু বুঝতে পারলেন না জয়পতাকা। তবে বসতে তাঁর আর সাহস হল না। কোমরের লাল সালুটা খুলে হাত-পা একটু মুছে নিয়ে ফের এগোতে লাগলেন। ধুতি-পাঞ্জাবি জলে ভিজে শপশপ করছে। দিগভ্রান্ত, শ্রান্ত, ক্লান্ত জয়পতাকা চলতে লাগলেন।

আচমকাই অন্ধকারে একবার পা বাড়াতেই তিনি টের পেলেন, সামনে মাটি নেই। পা'টা টেনে নেওয়ার একটা শেষ চেষ্টা করলেন উনি। কিন্তু স্পষ্ট টের পেলেন কে যেন তাঁকে পিছন থেকে একটু ঠেলে দিল। জয়পতাকা একেবারে লাট খেয়ে-খেয়ে এক বিশাল খাদের মধ্যে হুহু করে পড়ে যেতে লাগলেন।

পড়ছেন আর ভাবছেন, এটা কি ঠিক হয়েছে? আজই যে লোকটা অমন খ্যাপা কালু ষাঁড়কে জব্দ করল তার প্রতি ভগবানের এ কি বিচার? তবে কি কিছু লোকে ঠিক কথাই বলে? কালু কি তা হলে সত্যিই শিবের ষাঁড়? তার পিঠে সওয়ার হওয়া কি আমার উচিত হয়নি!

পড়তে অনকেটা সময় লাগছিল জয়পতাকাবাবুর। সেই ফাঁকে তিনি একটা হাই তুললেন এবং একবার আড়মোড়াও ভেঙে নিলেন। তারপর দ্বিতীয় হাইটা তুলতে গিয়ে একটা ধপাস শব্দ শুনলেন এবং শরীরে একটা প্রবল ঝাঁকুনি লাগল। বুঝলেন যে, তিনি পড়েছেন। তবে বেঁচে আছেন কি না বুঝতে পারছেন না, শ্বাস অবশ্য চলছে। বুকটাও ঢিবঢিব করছে।

খাদের মধ্যে অন্ধকার আরও জমাট, আরও নীরেট। জয়পতাকা চারদিক হাতড়ে হাতড়ে বুঝতে পারলেন, তিনি পড়েছেন রাজ্যের জমে থাকা শুকনো নরম পাতা আর পচা ডালপালার ওপর। সেটা এতই নরম যে, ফোম-রবারের গদিকেও হার মানায়। জয়পতাকাবাবুর ইচ্ছে হচ্ছিল, এখানে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দেন।

কিন্তু সেই মোলায়েম কণ্ঠস্বর এখানেও সঙ্গ ছাড়েনি। বলে উঠল, "ডিনারের গং বেজে যাবে যে; সাহেব ভারী রাগ করবেন।"

কণ্ঠস্বরটি যারই হোক লোকটি হয়তো তেমন খারাপ নয়। তা ছাড়া ডিনারের কথাও বলছে। জয়পতাকার পেটে এখন দাউ-দাউ খিদে। সুতরাং একটু দম নিয়ে তিনি খাদ থেকে উদ্ধারের ফিকির ভাবতে লাগলেন। আপাতদৃষ্টিতে এই গভীর খাদ থেকে উদ্ধারের কোনও পন্থাই নেই। যদিও বা থাকে, এই অন্ধকারে তা খুঁজে পাওয়ার ভরসা নেই। লতাপাতা বেয়ে যদি ওপরে উঠতে হয় তা খুঁজে পাওয়ার ভরসা নেই। লতাপাতা বেয়ে যদি ওপরে উঠতে হয় তা হলেও জয়পতাকা পেরে উঠবেন না। তাঁর গায়ে আর জোর নেই। জীবনেও তিনি ব্যায়াম-ট্যায়াম করেননি। কেবল বই পড়েছেন।

"এগোলেই হবে, পথ পেয়ে যাবেন।" সেই মোলায়েম গলাটি বলল। জয়পতাকা সুতরাং ব্যাজার মুখ করে এগোলেন। সরু খাদ লম্বা একটা গলির মতো। কোনও সময়ে ভূমিকম্পের ফলে মাটিতে গভীর ফাটল ধরেছিল। সেটাই এখন হাঁ-করা খাদ। দু'দিকে হাত বাড়ালেই এবড়োখেবড়ো দুটো দেওয়ালই স্পর্শ করা যায়। জয়পতাকা এরোপ্লেনের মতো দু'দিকে হাত বাড়িয়ে সাবধানে এগোতে লাগলেন। দশ-বারো পা হাঁটতেই ডান-ধারে আর-একটা গলি। কে যেন সেই গলির ভিতর থেকে চাপা গলায় বলে উঠল, "আসুন, এই পথ।"

জয়পতাকা অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে ঢুকে পড়লেন গলির মধ্যে। কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু পায়ের নিচে বেশ মসৃণ মাটি। একটা ঢালু বেয়ে ধীরে-ধীরে ওপরের দিকে উঠে গেছে।

কতক্ষণ ধরে যে হাঁটতে হল তা জয়পতাকার হিসেব নেই। হাঁটছেন তো হাঁটছেনই। পথ আর ফুরোচ্ছে না। জয়পতাকার বুদ্ধি-বিবেচনা তেমন কাজ করছে না। মাথাটা কেমন ধোঁয়া-ধোঁয়া লাগছে। ধকল তো বড় কম যায়নি। তিনি যন্ত্রের পুতুলের মতো হাঁটতে লাগলেন। হাঁটতে হাঁটতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

হঠাৎ মনে হল, পথ শেষ হয়েছে। সামনে ফাঁকা জমি। চোখ কচলে জয়পতাকা চাইলেন। দেখলেন, বেশ মাখো-মাখো একটু চাঁদের আলো দেখা যাচ্ছে। সামনে ঝোপঝাড় থাকলেও তেমন বড় গাছপালা নেই। আর জ্যোৎস্নায় অনকেটা বালিয়াড়ি চিকচিক করছে।

জয়পতাকা আরও কয়কে পা এগিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। দৃশ্যটা খুবই রহস্যময়। বালিয়াড়ির ঠিক মাঝখানে একটা বাড়ির মতো কিছু দেখা যাচ্ছে। বেশ বড় বাড়ি। তবে অন্ধকার। জ্যোৎস্নায় সেটাকে ধ্বংসস্তূপ বলেই মনে হতে লাগল তাঁর।

জঙ্গলের মধ্যে হরিণের গলা ঝাড়বার মত বিশ্রী 'হ্যাক হ্যাক' ডাক শুনতে পেলেন। তারপরই চাপা একটা গর্জন। এক শিংঅলা হরিণ তীরবেগে পিছনের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে বালিয়াড়িতে পড়ে ছুটতে লাগল। কিন্তু দশ কদমও যেতে পারল না। জয়পতাকা বিস্ময়ে গোলাকার চোখে দেখলেন হরিণটার চারটে পা বালিতে বসে গেল। তারপর পেট অবধি, তারপর সমস্ত শরীরটা মাত্র কয়কে সেকেন্ডে অদৃশ্য হয়ে গেল বালির তলায়। একটা চিতা বাঘ বালিয়াড়ির ধারে কিছুক্ষণ পায়চারি করে আবার জঙ্গলে ঢুকে গেল।

জয়পতাকা শুকনো মুখে একটা ঢোঁক গিললেন, এই সাঙ্ঘাতিক চোরাবালির মাঝখানে বাড়ি তৈরি করেছিল কে? কীভাবেই বা করল?

হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল। পটাশগড় নামটা যা থেকে হয়েছে তা আসলে একটা কেল্লা। এই কেল্লার নামই পটাশগড়। শোনা যায় সাধারণত কেল্লার চারধানে পরিখা থাকে, পটাশগড়ের চারধারে পরিখা ছিল না ছিল চোরাবালি। কেল্লা যারা আক্রমণ করতে আসত তাদের সমাধি রচিত হত চোরাবালিতে। পটাশগড়ে তাই

বাইরের শত্রু কখনও ঢুকতে পারত না। কিন্তু এ-গল্প কিংবদন্তি বলে জয়পতাকা বিশ্বাস করেননি। তা হলে কি এই সেই কুখ্যাত পটাশগড়?

জয়পতাকা অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে রইলেন। চারদিকে হাহাকারের মতো চোরা বালিয়াড়ি। মাঝখানে একটা ধ্বংসস্তূপ, কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে মৃদু জ্যোৎস্নায়!

"ডিনারের আর দেরি নেই। সময় হয়ে এল।"

জয়পতাকা চারদিকে ত্রস্ত হরিণের মতো তাকালেন। ফাঁকা জায়গা, কেউ লুকিয়ে থাকলেও আন্দাজ করতে পারবেন। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। ফের যখন বাড়িটার দিকে ফিরে তাকালেন জয়পতাকা, তখন তাঁর চক্ষুস্থির হয়ে গেল। ধ্বংসস্তূপ আর নেই। সেই জায়গায় ছোট্ট একটা দোতলা কেল্লা যেন দুধে স্নান করে ঝকঝক করছে। ঘরে-ঘরে বাতি জ্বলছে। কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে!

"যান, সামনেই রাস্তা। সাহেব অপেক্ষা করছেন।"

"কে আপনি?" হুঙ্কার দিলেন জয়পতাকা।

কেউ জবাব দিল না। একটা দমকা বাতাস হা হা করে বয়ে গেল শুধু।

জয়পতাকা ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন। কিন্তু পারলেন না। পায়ে-পায়ে তিনি এগিয়ে যেতে লাগলেন সম্মোহিতের মতো।

আশ্চর্যের বিষয়, তিনি বালিয়াড়িতে নামবার আগেই একটা শেয়াল কোত্থেকে এসে তাঁর আগে নেমে পড়ল। তারপর তাঁর দিকে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে চেয়ে দুলকি চালে চলতে লাগল। চোরাবালিতে শেয়ালটা ডুবল না।

জয়পতাকা শেয়ালটার পিছু-পিছু হাঁটতে লাগলেন। পায়ের নিচে বেশ শক্ত আঁট বালি। কোথাও তেমন ভুসভুসে নয়। তা হলে কি ধরে নিতে হবে যে, চারদিকে চোরাবালি থাকলেও কেল্লায় যাওয়ার একটা রাস্তা আছে? জয়পতাকা তাঁর পকেট থেকে একটা কাঁচা টাকা বের করে পাশে দেড়ফুট তফাতে ছুঁড়ে দিলেন। সেটা ভুস করে ডুবে গেল। জয়পতাকা তাঁর শস্তার কলমটাও ছুঁড়ে দিয়ে পরীক্ষা করলেন। সেটাও চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বেশ বোঝা যাচ্ছিল চোরাবালির ভিতর দিয়ে একটি সরু চোরাপথ রয়েছে কেল্লার যাওয়ার জন্য। সেটা হাতখানেকের চেয়ে বেশি চওড়া নয়। বেভুলে একটু এদিক-ওদিক পা ফেললেই বেমালুম বালির মধ্যে গায়েব হয়ে যেতে হবে। জয়পতাকা শেয়ালটার পিছু-পিছু চলতে লাগলেন। কেল্লার জমিতে যখন পা রাখলেন, তখন উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় তাঁর ঘাম হচ্ছে।

কিন্তু চারদিকে বালিয়াড়ির মধ্যে চমৎকার মরুদ্যানের মতো বাগান দেখে জয়পতাকার প্রাণ জুড়িয়ে গেল, ভারী সুন্দর বাগান। পাথরে বাঁধানো ফোয়ারা থেকে জল ছড়িয়ে পড়ছে গোল পাথরের চৌবাচ্চায়। কেল্লাটি বেশ ছোট। শ্বেতপাথরের চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরের দিকে। সামনেই সিংহদরজা। জয়পতাকা নির্বিঘ্নে সিংহদরজায় পৌঁছে চারদিকে চাইলেন। কোনও পাহারাদার নেই। মানুষজন নেই। কিন্তু ভিতরে ঘরে-ঘরে ঝাড়বাতির উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। একটা পিয়ানোর মিষ্টি শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। ক্ষুধাতুর ক্লান্ত জয়পতাকা ভিতরে ঢুকলেন।

"আসুন, আসুন, ডান দিকে ডাইনিং-হল। ঢুকে পড়ুন?" সেই মোলায়েম গলা।

জয়পতাকা চারদিকে আবার চাইলেন। কেউ নেই।

ডান দিকে একটা টানা চওড়া বারান্দা। ঝকঝক করছে পরিষ্কার। বারান্দা পেরিয়েই মস্ত লম্বা ডাইনিং-হল। অন্তত পঞ্চাশজন বসে খেতে পারে এত বড় মেহগনির টেবিল। তার ওপর মোমদানিতে সার-সার মোম জ্বলছে। ওপরে জ্বলছে অন্তত দশটা ঝাড়বাতি। টেবিলের ওপর থরে-থরে খাবার সাজানো। গন্ধে বাতাস ম-ম করছে। কিন্তু কেউ নেই।

জয়পতাকা থমকে দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ একটা শব্দ পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, টেবিলের চারধারে সাজানো চেয়ারের মধ্যে একটা চেয়ার কে যেন পিছনে টেনে সরিয়ে দিয়েছে।

"বসুন। ডিনারের সময় হয়েছে।" সেই বিনয়ী গলা।

হঠাৎ একটি মিষ্টি গং বেজে উঠল অলক্ষ্যে।

জয়পতাকা সম্মোহিতের মতো টানা চেয়ারটায় বসলেন। ভারী অস্বস্তি হচ্ছে। গা-ছমছম করছে। আবার খিদেও ভয়ানক। একটু দ্বিধাগ্রস্ত হাতে তিনি চামচ তুলে নিলেন। তারপর খাওয়া শুরু করলেন।
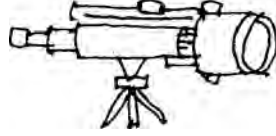
রাতে রোজকার মতো দাবা খেলতে বসে জয়ধ্বনি বললেন, "বুঝলে লাহিড়ী, তুমি বয়সকালে অনকে শেয়াল-টেয়াল মেরেছ বটে, রোগাপটকা লোকদের ধরে-ধরে এনে কুস্তিতেও হারিয়েছ, কিন্তু আমার নাতি জয়পতাকা আজ যা কাণ্ড করেছে শুনলে তোমার নিজের জন্য দুঃখ হবে।"

শ্যাম লাহিড়ী খুব গম্ভীর মুখে বললেন, "তোমার নাতির ঘটনা সবই শুনেছি। কিন্তু বয়সকালে আমি মোটেও শেয়াল মারিনি। মেরেছি পাগলা হাতি আর মানষুখকো বাঘ।"

জয়ধ্বনি খিঁচিয়ে উঠে বললেন, "রাখো রাখো। মেরেছ তো বন্দুক দিয়ে। ভারী বাহাদুরি। বাঘের তত দাঁত-নখ ছাড়া কিছু নেই, হাতি বেচারার সম্বল শুধু গায়ের জোর আর শুঁড়, তাদেরও যদি রাইফেল-বন্দুক থাকত তা হলেও না হয় বুঝতাম। পারবে আমার নাতির মতো খালি হাতে লড়তে? আমি তো জয়পতাকাকে একটা সোনার মেডেল দেব বলেছি। একটু আগে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে গেল, শুনেছ? জয়পতাকাকে পরশু নাগরিক সংবর্ধনাও দেওয়া হবে।"

"শুনেছি। আরও শুনেছি, ওইদিনই আবার জয়পতাকাকে নিন্দা করে আর-একটা সভায় একটা প্রস্তাবও নেওয়া হবে। ওই মর্কট ব্যোমকেশ দুটো সভারই সভাপতি।"

"কিছু লোকে হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মরছে। তারাই করছে ওসব।"

শ্যাম লাহিড়ী একটা বড় শ্বাস ফেলে বললেন, "জয়পতাকা খুব ভাল ছেলে। শুনেছি তার অঙ্কের মাথা খুব সাফ।"

"শুধু অঙ্ক? অঙ্ক ম্যাথমেটিক্স অ্যালজেব্রা, জিওমেট্রি, পাটীগণিত, জ্যামিতি, অ্যারিথমেটিক, বীজগণিত কোনটায় নয় বলো! শুনেছি ভূগোল, ইতিহাস এসবও তার মাথায় খুব খেলে। বিজ্ঞান বলো বিজ্ঞান, সায়েন্স

বলল সায়েন্স, কোনটায় সে কার চেয়ে কম?”

শ্যাম লাহিড়ী গম্ভীর মুখে বললেন, “দ্যাখো জয়ধ্বনি, তুমি সেই যে কাশীর টোলে সংস্কৃত শিখে এসেছিলে, তারপর আর দুনিয়ার কিছুই শেখোনি।”

জয়ধ্বনি ফের খিঁচিয়ে উঠে বললেন, “যে সংস্কৃত শিখেছে তার আবার কিছু শেখার আছে নাকি? সংস্কৃত হচ্ছে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, দু’পাতা ইংরেজি, দু’পাতা অঙ্ক শিখলেই বুঝি চতুর্ভুজ হওয়া যায়? এই যে তুমি এত শিখলে, গাদা-গাদা পড়া মুখস্থ করলে, তা পারলে ব্যোমকেশের মতো মুখ্যুর সঙ্গে এঁটে উঠতে? তুমি এত শিখে বুড়ো বয়সে ঘরে বসে-বসে লেজ নাড়ছ, আর ওদিকে ব্যোমকেশ পৌরপিতা হয়ে কত জায়গায় দাবড়ে বক্তৃতা দিয়ে আসর গরম করে বেড়াচ্ছে।”

শ্যাম লাহিড়ী মৃদু মৃদু হেসে বললেন, “ভুলে যাচ্ছ কেন যে, এটা কলিযুগ! কলিযুগে কী হয় জানো? যত ভাল লোক সবাই মাথা নিচু করে থাকে। আর খারাপ, মুখ্যু, অপদার্থরা দাবড়ে বেড়ায়।”

“ওসব হচ্ছে হিংসুটেদের মতো কথা। ব্যোমকেশের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে তুমি এখন কলিযুগের দোহাই দিচ্ছ। কলিযুগ তো কী? এই কলিযুগেই তো আমার নাতি কত বড় একখানা কাণ্ড করে দেখাল।”

শ্যাম লাহিড়ী নিমীলিত চোখে চেয়ে বললেন, “তোমার নাতি হল সাক্ষাৎ কল্কি অবতার। তা সেই জাম্বুবানটা কালুর পিঠে চেপে গেলই বা কোথায়?”

“সে কালুকে দেশছাড়া করে তবে ফিরবে।”

শ্যাম লাহিড়ী মৃদু একটু হেসে বললেন, “তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, কালুর কত বয়স তা জানো?”

জয়ধ্বনি একটু বিপাকে পড়ে মাথা চুলকে বললেন, “কালুর বয়স! তা মন্দ হবে না। অনকেকাল ধরেই তো তাকে দেখছি।”

“আমার হিসেবমতো সত্তরের ওপর। আশির কাছাকাছি।”

“তা হবে, তাতে কী?”

“তোমার নাতি যে কালুকে জব্দ করেছে বলে খুব বড়াই করছ, তুমি কি জানো যে, কালুর চোখে ছানি এসেছে! তার ব্লাডপ্রেশারও বেশ হাই! হার্টেরও একটু গোলমাল আছে। সে সুস্থ সবল এবং তরুণ হলে জয়পতাকা কি তাকে কাবু করতে পারত?”

জয়ধ্বনি হাঁ করে কিছুক্ষণ শ্যাম লাহিড়ীর দিকে চেয়ে থেকে বললেন, “কালুর চোখে ছানি? প্রেশার!! হার্ট-ট্রাবল? ইয়ার্কি মারার আর জায়গা পাওনি? তোমার সঙ্গে দাবা খেলতে বসাই আমার ভুল হয়েছে। আমি চললুম।”

এই বলে রাগ করে জয়ধ্বনি দাবার ঘুঁটি হাটকে-মাটকে দিয়ে উঠে পড়লেন।

শ্যাম লাহিড়ী খুব শান্ত গলায় বললেন, “তোমার রাগের কারণও জানি। এই চালটা তুমি বাঁচাতে পারতে না। আমার গজ পরের চালেই তোমার রাজা-মন্ত্রী একসঙ্গে ধরত, সেই ভয়েই না উঠে পড়লে।”

জয়ধ্বনি রাগের চোটে লাট্টুর মতো বোঁবোঁ করে দুটো চক্কর খেয়ে নিয়ে বললেন, “আমাকে ঘাঁটিও না বলছি লাহিড়ী। রাজা-মন্ত্রী ধরলেই হল? আমি তোমার ও চাল অনকে আগেই দেখে নিয়েছি। রাজা-মন্ত্রী ধরলে

ঘোড়া দিয়ে চাল চাপা দিতুম। তারপর বোড়ে ঠেললেই তোমার গজ লেজ তুলে পালিয়ে যেত, যেমন আমার নাতির পাল্লায় পড়ে কালু পালিয়েছে। বুঝলে?"

শ্যাম লাহিড়ী গম্ভীর হয়ে বললেন, "রাগ কোরো না। বোসো। কালু পালিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তোমার নাতিকে পিঠে নিয়েই পালিয়েছে। ব্যাপারটা আমার সুবিধের ঠেকেছে না। যতদূর খবর পেয়েছি, কালু জয়পতাকাকে পিঠে নিয়ে উত্তর দিকে গেছে। ওদিকটায় পটাশগড়ের জঙ্গল। জায়গাটার খুব সুনাম নেই, তুমিও জানো।"

জয়ধ্বনি এবার একটু নরম হলেন। বসলেনও। তারপর বললেন, "পটাশগড়ের জঙ্গলেই যে ঢুকেছে তার তো কোনও প্রমাণ নেই।"

শ্যাম লাহিড়ী মাথা নেড়ে বললেন, "নেই। তবে তোমাকে যা বললুম তা ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিও না। কালুর চোখে ছানি পড়েছে কি না বা তার রক্তচাপ আছে কি না, তা জানি না। কিন্তু খ্যাপা ষাঁড় খুবই ভয়ঙ্কর। তার দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। যদি পটাশগড়ের জঙ্গলেই ঢুকে থাকে, তা হলে একটু ভাবনার কথা। তোমার নাতি যত বীরই হোক, তাকে আমি বেজায় ভীতু বলেই জানি।"

জয়ধ্বনি এবার চিন্তিত মুখে কোঁচার খুঁট দিয়ে মুখখানা মুছে বললেন, "এ তো বেশ ভাবনায় ফেললে ভায়া।"

শ্যাম লাহিড়ী খুবই বিষণ্ণ মুখে বললেন, "আমি যখন শিকার করতুম তখনও পারতপক্ষে পটাশগড়ের জঙ্গলে যেতুম না। যে-বারকয়কে ওখানে ঢুকেছি, প্রতিবারই নানারকম অভিজ্ঞতা হয়েছে।"

"কীরকম অভিজ্ঞতা?"

"শুনলে তুমি তোমার নাতির জন্য দুশ্চিন্তা করবে।"

জয়ধ্বনি একটু খিঁচিয়ে উঠে বললেন, "ওটা বলে তো দুশ্চিন্তা আরও বাড়িয়ে দিলে। পটাশগড় সম্পর্কে আমিও নানারকম শুনে আসছি বহুকাল ধরে। তা বলে বিশ্বাস করিনি।"

শ্যাম লাহিড়ী মৃদু হেসে বললেন, "তুমি হচ্ছ কুনো বীর। ঘরে বসে ধারণা তৈরি করো, বিশ্বাস করো না ভাল কথা, কিন্তু পটাশগড়ের জঙ্গলে তুমি ঢোকোওনি কোনওদিন। কেন ঢোকোনি জানো? ভয়ে।"

জয়ধ্বনি মহা খাপ্পা হয়ে ফের উঠে পড়লেন, "ভয়! ভয়! আমাকে তুমি ভয়ের কথা বলছ? যদি ভীতুই হতুম হে, তা হলে আমার নাতি আজ এত বড় বীর বলে নাম করতে পারত না। আর জঙ্গলেই বা কেন আমাকে যেতে হবে হ্যাঁ! আমি কাঠুরে না মউলি, না তোমার মতো শেয়াল-তাড়ুয়া শিকারি যে জঙ্গলে-মঙ্গলে ঘুরে নিজেকে বড় বীর বলে জাহির করতে হবে? আর তোমার বীরত্বও খুব জানা আছে। সেবার ফাগু সিং যখন কুস্তি লড়তে এল, সেবার তো বাপু ন্যাজ দেখিয়েছিলে। ঘর থেকে বারটি পর্যন্ত হলে না। ফাগু সিং লজ্জায়, ঘেন্নায় শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় বলে গেল, লাহিড়ীবাবুকে আমি বীর বলে শুনেছিলুম। আরে ছোঃ, এ তো দেখছি এক নম্বরের ডরফোক লোক।"

শ্যাম লাহিড়ী চোখ বুজে ছিলেন। মৃদু-মৃদু মাথা নেড়ে বললেন, "ফাগু সিং যখন এসেছিল তখন আমি এ-শহরে ছিলুম না। যদি থাকতুম, তা হলে ফাগু সিংকে বৃন্দাবন দেখিয়ে দিতুম।"

"ছিলে না মানে? আলবাত ছিলে! তবে ঘরের মধ্যে পালিয়ে ছিলে।"

“বোসো হে বোসো। নিজেকে বীর বলে জাহির করার কোনও দরকারই নেই আমার। বিশ বাইশ বছর আগকোর খবরের কাগজ খুললে দেখতে পাবে যে, ফাগু সিংকে আমি অন্তত চারবার হারিয়েছি। সে এ-শহরে এসেছিল শেষবারের মতো আমাকে হারানোর চেষ্টা করতে।”

কথাটা যে মিথ্যে নয় তা জয়ধ্বনি জানেন। বাস্তবিকই ফাগু সিং-এর মতো দুর্দান্ত কুস্তিগিরকে একসময়ে শ্যাম লাহিড়ী পটাপট হারিয়ে দিতেন। তবু জয়ধ্বনি ফের টেবিলে চাপড় মেরে বলেন, “সবাই জানে রামগড়ের জঙ্গলে তুমি যে বাঘটা মেরেছিলে সেটা ফোকলা ছিল। তার একটাও দাঁত ছিল না। সেই বাঘটাকে তুমি ম্যান ইটার বলে চালানোর চেষ্টা করেছিলে।”

শ্যাম লাহিড়ী মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন, “রামগড়ের বাঘটা মোটেই ফোকলা ছিল না। তার দুটো সামনের দাঁত কোনও কারণে ভেঙে গিয়েছিল। তাতে মানুষ খেতে তার কোনও অসুবিধে হত না। সে কড়মড় করে হাড়গোড় গুঁড়িয়েই মানুষ খেত।”

জয়ধ্বনি হার মানার লোক নন। সতেজে বললেন, “আর ইংরেজি বলতে পারে বলে যে তোমার বড় অহঙ্কার, সেটাও ঠিক নয়। ব্যোমকেশ তো সেদিনও বলছিল, শ্যাম লাহিড়ী সাহেবদের সঙ্গে খুব ফটাফট ইংরেজি বলে বটে, কিন্তু সব ভুল ইংরেজি। শুনে সাহেবরা আড়ালে হাসে।”

“ইংরেজি ভুল বলি না ঠিক বলি তা ধরার মতো বিদ্যে ব্যোমকেশের পেটে নেই। সেটা তুমিও জানো। খামোখা চটেমটে আমার ওপর ঝাল ঝাড়ছ কেন? মাথা ঠাণ্ডা করে বসে আসল কথাটা শোনো।”

জয়ধ্বনি ফুঁসছিলেন। তবে বসেও পড়লেন। তাঁদের দু'জনের মধ্যে এরকম ঝগড়া রোজই হয়। মাঝে-মাঝে মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। আবার গুটিগুটি এ-ওঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়ে লাজুক-লাজুক মুখ করে, হাঁক দেন, “ভায়া, আছ নাকি?” জয়ধ্বনির মাথাটা একটু বেশি গরম, শ্যাম লাহিড়ী ভারী ঠাণ্ডা মাথার লোক।

জয়ধ্বনি বসে কোঁচা দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে বললেন, “হ্যাঁ, পটাশগড়ের কথা কী যেন বলছিলে? যা-ই কেন বলো না, ওসব কথায় আমার কিন্তু তেমন বিশ্বাস নেই।”

“বিশ্বাস করা না-করা তোমার ইচ্ছে। তবে জায়গাটা সুবিধের নয়।”

জয়ধ্বনি চিন্তিতভাবে বললেন, “বাঘ-ভালুকের ভয় অবশ্য আছে। কিন্তু আমার ধারণা, কালু খুব চালাক ষাঁড়, সে জয়পতাকাকে পিঠে নিয়েই ঠিক ফিরে আসবে।”

“তাও আসতে পারে। তবে আধঘণ্টা আগে খবর পেলুম, কালু ফিরে এসেছে। বাজারে ঢুকে কার যেন সাতটা মোচা চিবিয়ে খেয়েছে। সঙ্গে কয়কে কেজি চালও সাপটে নিয়েছে। এখন বটতলায় বসে জিরেন নিচ্ছে।”

জয়ধ্বনি পাংশুমুখে বললেন, “তা হলে?”

“সেইটেই তো কথা।”

“আমার মনে হয়, জয়পতাকা কালুর পিঠ থেকে নেমে হেঁটে বাড়ি ফিরে গেছে।”

“অসম্ভব নয়। তবে যদি বাড়ি না ফিরে থাকে তা হলে ঘাবড়ে যেও না।”

জয়ধ্বনি বুক ফুলিয়ে বললেন, “মোটেই ঘাবড়ে যাইনি। জয়পতাকা যে বীরত্বের কাজ করেছে তাতে আমার স্থির বিশ্বাস, সে বিপদে পড়লেও বেরিয়ে আসতে পারবে।”

শ্যাম লাহিড়ী খুশি হয়ে বললেন, “শাবাশ!”

এই সময়ে কাজের লোক এসে বলল, “হেডসার বিষ্ণুবাবু দেখা করতে এসেছেন।”

শ্যাম লাহিড়ী তটস্থ হয়ে বললেন, “নিয়ে আয়।”

বিষ্ণুবাবু একা নন, সঙ্গে আরও দু'জন মাস্টারমশাই এসে ম্লানমুখে ঢুকলেন। বিষ্ণুবাবু বললেন, “জয়পতাকাকে নিয়ে কালু পটাশগড়ের জঙ্গলে ঢুকেছিল বলে খবর পেয়েছি। রাখাল ছেলেরা দেখেছে। কালু একটু আগে ফিরে এলেও জয়পতাকা ফেরেনি। আমরা বেশ ভাবনায় পড়েছি। কাল ছুটি বটে, কিন্তু পরশু থেকে স্কুলে অঙ্ক করানোর ভাল লোক নেই।”

জয়ধ্বনি ফুঁসে উঠে বললেন, “শুধু অঙ্কই বা কেন, অ্যারিথমেটিক, জিওগ্রাফি, জিওমেট্রি, অ্যালজেব্রা, ম্যাথমেটিকস, ভূগোল, ইতিহাস, সায়েন্স, হিস্টরি, বিজ্ঞান এসবও তো সে পড়ায়।”

“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

শ্যাম লাহিড়ী একটু ভেবে বললেন, “যদি গড়-ভুতুয়ার পাল্লায় পড়ে না থাকে তা হলে চিন্তা নেই।”

“গড়-ভুতুয়াটা কী বস্তু হে!”

“গড়-ভুতুয়া নামটা আমারই দেওয়া। পটাশগড়ের জঙ্গলে একটা পুরনো কেল্লা আছে বলে শোনা যায়। এমনিতে সেখানে যাওয়া যায় না। তবে গড়-ভুতুয়া ধরলে যেতেই হয়। সেটা ভারী মিস্টিরিয়াস জায়গা।”

জয়ধ্বনি বিরক্ত হয়ে বললেন, “আহা, গড়-ভুতুয়াটা কী জিনিস সেটা বলবে তো! ভূত নাকি?”

“তার চারদিকে গহিন চোরাবালি। একটা মাত্র সরু পথ আছে। কিন্তু সেটা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। গড়-ভুতুয়া যদি নিয়ে যায় তো ভাল, কিন্তু বেরোবার সময় সে কিছুতেই পথ দেখায় না। তখনই বিপদ। আমার চেনা-জানা তিনটে সাহেব সেখান থেকে আর ফেরেনি।”

জয়ধ্বনি উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, “আমি ওসব গাঁজাখুরিতে বিশ্বাস করি না। কিন্তু এর একটা বিহিতও তো করা দরকার।”

বিষ্ণুবাবু বললেন, “স্কুলের বড় ছেলেরা অবশ্য সবাই লাঠি-সোটা, টর্চ, হ্যারিকেন নিয়ে পটাশগড়ের জঙ্গলে গেছে। শহরের আরও কিছু ডাকাবুকো লোকও আছে তাদের সঙ্গে। খুঁজে পেলে নিয়ে আসবে।”

শ্যাম লাহিড়ী চিন্তিত মুখে একটা দাবার ঘুঁটি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

জয়ধ্বনি উঠে পড়ে বললেন, “তা হলে আমিও ঘরে বসে থাকতে পারব না। আমার নাতির যদি বিপদ হয়, তা হলে আর আমার বেঁচে থাকার মানেই হয় না। আমি চললুম।”

শ্যাম লাহিড়ী বললেন, “গেলেই তো হবে না। আটঘাট বেঁধে যেতে হবে। বোসো জয়ধ্বনি। আমিও তৈরি হয়ে নিই।”

“তুমি যাবে!”

“আমার যাওয়াটা বিশেষ দরকার। পটাশগড়ের জঙ্গলে আমি তবু বারকয়েক গেছি, অন্য সবাই আনাড়ি।”

জয়ধ্বনি বসে লাঠিটা বাগিয়ে ধরে বললেন, “যদি বাঘে তাকে ধরে তো পিটিয়ে ছাতু করব।”

শ্যাম লাহিড়ী মৃদু হেসে বললেন, “জঙ্গলে মেলা বড় গাছ আছে। তার একটায় উঠে পড়লে বাঘ তেমন কিছু করতে পারবে না। জয়পতাকা বুদ্ধিমান ছেলে। কিন্তু আমার ভয় অন্য। গড়-ভুতুয়া বড় পাজি জিনিস। লোককে বেভুল ভুলিয়ে-ভালিয়ে গড়ে নিয়ে তোলে। আমাকেও চেষ্টা করেছিল। সেবার আমার হাউন্ড কুকুর

জিমি সঙ্গে থাকায় বেঁচে যাই। সে আমার প্যান্ট কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে এসেছিল। থাকগে সেসব কথা। শুনুন বিষ্ণুবাবু, আমি পটাশগড়ের জঙ্গলে যাচ্ছি। কিন্তু সঙ্গে ব্যোমকেশকেও যেতে হবে। আপনারা তাঁকে গিয়ে বলুন।"

বিষ্ণুবাবু বললেন, "উনি যাবেন বলে মনে হয় না। ভারী ভীতু লোক। তার ওপর কাল ওঁর দু-দুটো সভা। একটা জয়পতাকা সংবর্ধনা সভা, আর-একটা জয়পতাকা ধিক্কার সভা। উনি এখন দু-দুটো বক্তৃতা মুখস্থ করছেন।"

শ্যাম লাহিড়ী গম্ভীর মুখে বললেন, "তা বললে চলবে না। ব্যোমকেশকে গিয়ে বলুন যে, সে যদি না যায় তা হলে সে কাপুরুষ বলে ভোটারদের কাছে রটিয়ে দেব, ভোটাররা আর তাকে ভোট দেবে না।"

বিষ্ণুবাবু উঠতে উঠতে বললেন, "আমাদেরও যেতে হবে কি?"

শ্যাম লাহিড়ী মাথা নেড়ে বললেন, "অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট, আপনি বরং যাদের পটাশগড়ে পাঠিয়েছেন তাদের ডেকে আনার ব্যবস্থা করুন। যদি তাকে গড়-ভুতুয়াই ধরে থাকে, তবে বেশি লোক গিয়ে লাভ নেই।"

"মোটে আপনারা তিনজন যাবেন?"

"তাই যথেষ্ট। আর কাউকে যেতে হবে না।"

জয়ধ্বনি বলে উঠলেন, "তা হলে ব্যোমকেশকেই বা নিচ্ছ কেন?"

"তাকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। লোকটা হিংসে করে। তার ওপর লোকটা বেজায় ভীতু। পেটে বিদ্যে নেই, কেবল বক্তৃতার জোরে টিকে আছে। বক্তৃতার জোরেই পৌরপিতা হয়েছে। সত্যিকারের কাজ কিছু করেনি। আহাম্মকটাকে দিয়ে কিছু করাতে হবে।"

এই বলে শ্যাম লাহিড়ী উঠে তৈরি হতে গেলেন। ভিতরের ঘরে পোশাক পালটাতে এসেই কিন্তু শ্যাম লাহিড়ীর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি ভালই জানেন, জয়পতাকাকে যদি গড়-ভুতুয়া ধরে থাকে তা হলে পটাশগড়ের জঙ্গল তন্নতন্ন করে খুঁজলেও লাভ নেই। পটাশের ওই অদ্ভুত কেল্লায় কেউ এমনিতে পৌঁছতে পারে না। গড়-ভুতুয়া যদি পথ চিনিয়ে না নিয়ে যায়, তা হলে পরিশ্রমই সার হবে। তা বলে ঘরে হাত-পা গুটিয়ে থাকাও চলে না। তাঁর বন্ধু জয়ধ্বনিকে এখন ব্যস্ত রাখা দরকার। নইলে নাতির চিন্তায় লোকটার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেতে পারে।

বাইরে বেরোবার পোশাক পরে পকেটে একটা ছয়ঘরা রিভলবার ভরে নিলেন শ্যাম লাহিড়ী। হাতে টর্চ আর নাল পরানো লাঠি। দুশ্চিন্তায় তাঁর বুকটা শুকিয়ে আছে। জয়পতাকাকে তিনি কোলেপিঠে করেছেন। খুব বিনয়ী, বুদ্ধিমান, ভাল ছেলে। পটাশের কেল্লায় যদি তাকে গড়-ভুতুয়া নিয়ে ফেলে থাকে, তা হলে উদ্ধারের আশা একরকম নেই। ওই কেল্লা নিয়ে অনকে কিংবদন্তি আছে। কিন্তু কিংবদন্তিগুলোও পরস্পরবিরোধী। এই পর্যন্ত মোট ত্রিশ-চল্লিশজন লোক পটাশের গড় দেখতে পেয়েছে বলে জানা গেছে। কিন্তু কেউ বলে, গড়ের চারপাশে যে চোরাবালি আছে তা বোঝবার উপায় নেই। লতাপাতা ঘাসের চাঙড় দিয়ে এমন ঢাকা থাকে যে পা দেওয়ার পর বোঝা যায় ঘাসের নিচে চোরাবালি আছে। অনেকে বলে, কেল্লাটাও লতাপাতায় ঢাকা একটা ধ্বংসস্তূপ মাত্র। আবার কেউ বলে চোরাবালির ওপর লতাপাতা মোটেই নেই। আর কেল্লাটা মোটেই ধ্বংসস্তূপ নয়, রাত্রিবেলা সেখানে উজ্জ্বল আলো দেখা যায়, ডিনারের ঘন্টার শব্দ পাওয়া যায়। কয়েকজন সাহেব একবার পটাশগড়ের জঙ্গল জরিপ করে মানচিত্র তৈরি করেছিল। সেখানে চোরাবালির কথা আছে, কিন্তু কেল্লার উল্লেখই নেই। অথচ সেই দলেরই একজন সাহেব নাকি এক সন্ধেবেলা 'ডিনার খেতে যাচ্ছি' বলে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গিয়ে আর ফেরেনি। তার সঙ্গীদের সন্দেহ, লোকটা হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়ে চোরাবালিতে ডুবে মরেছে। শ্যাম লাহিড়ীর নিজের অভিজ্ঞতা অবশ্য সেই পাগলা-সাহেবের সঙ্গেই মেলে। তিনি একবার পাগলা হাতির খবর পেয়ে পটাশগড়ের জঙ্গলে ঢুকেছিলেন। সঙ্গে জিমি ছিল। সেই সময়ে সন্ধেবেলা তিনিও বাতাসে উড়ো একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলেন 'ডিনারের সময় হল'। নানা বেভুল রাস্তায় ঘুরপাক খেতে-খেতে যখন চোরাবালির প্রান্তে পৌঁছে গেছেন এবং একটি অন্ধকার ধ্বংসস্তূপ দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেছেন, সেই সময়ে জিমি তাঁর প্যান্ট কামড়ে ধরে প্রবল প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। অল্পের জন্য তিনি বেঁচে যান। জিমিই তাঁকে পথ দেখিয়ে একরকম টানতে টানতে নিয়ে আসে জঙ্গলের বাইরে।

বেরোবার মুখে বিষ্ণুবাবু এসে ম্লান মুখে বললেন, "ব্যোমকেশবাবু যেতে পারবেন না। তাঁর একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বর। কম্বল মুড়ি দিয়ে কোঁ-কোঁ করছেন।"

শ্যাম লাহিড়ী একটু হেসে বললেন, "বলুন গিয়ে, পৌরপিতা হিসেবে তাঁর কিছু কর্তব্য আছে। যদি ভয় খেয়ে থাকেন, তবে তাঁর বদনাম হবে। তিনি যদি একান্তই না যান, তা হলে এবার মিউনিসিপ্যাল ইলকেশনে

আমি তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াব।”

বিষ্ণুবাবু চলে গেলেন।

দশ মিনিটের মাথায় শ্যাম লাহিড়ীর বাড়ির সামনে একটা রিকশা এসে থামল। ব্যোমকেশবাবু প্রকাণ্ড একখানা লাঠি হাতে লাফ দিয়ে নেমে বেশ চেঁচিয়ে রাস্তার লোককে শুনিয়ে বললেন, “শহরের সবচেয়ে বড় বীর ছেলেটা জঙ্গলে হারিয়ে গেল এটা কি ইয়ার্কি নাকি? যতদিন আমার দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণ এরকম কাণ্ড বরদাস্ত করব না। ভাইসব, এই আমি চললুম জয়পরাজয়বাবুকে ফিরিয়ে আনতে। না, না, কঠোর কর্তব্যকর্মে আপনারা কেউ আমাকে বাধা দেবেন না। আমি যাবই।”

এই বলে ব্যোমকেশ বাঁদুরে টুপিটা খুলে একগাল হেসে শ্যাম লাহিড়ীকে বললেন, “দাদাও যাচ্ছেন বুঝি? বাঃ বাঃ, বেশ হল।”

শ্যাম লাহিড়ী গম্ভীর হয়ে বললেন, “তোমার নাকি খুব জ্বর?”

ব্যোমকেশ মাথা চুলকে বললেন, “লোকে সারাক্ষণ এসে এত জ্বালাতন করে যে, ওসব একটু বানিয়ে বলতেই হয়। অপরাধ নেবেন না। দিনরাত লোকসেবা করে করে হাড়ে ঘুণ ধরে গেল। তা দাদা কি সত্যিই ইলকেশনে দাঁড়াবেন? আপনি দাঁড়ালে তো আমার আশা নেই।”

শ্যাম লাহিড়ী জবাব দিলেন না।
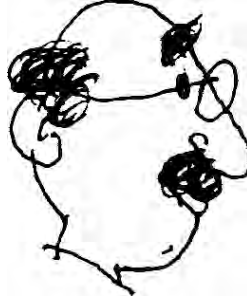
ভুতু যদি কাঁকড়াবিছে ক্লাসে না ছাড়ত তা হলে সে ভজুরাম মেমোরিয়াল স্কুলের ফুটবল টিমে চান্স পেত। যদি ফুটবল টিমে চান্স পেত তা হলে সে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কালুকে খেপাত না। কালু যদি না খেপত, তা হলে জয়পতাকাবাবুর মতো ভীতু আর নিরীহ লোকের ভিতরে বীরত্ব জেগে উঠত না। বীরত্ব না জাগলে এত লোক আজ জয়পতাকাবাবুকে মাটাডোরের ভূমিকায় দেখতে পেত না এবং মস্ত বড় একটা অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হত। আর ষাঁড়ের লড়াই না হলে জয়পতাকাবাবু কোনওদিনই কালুর পিঠে চড়ার মতো বিরল অভিজ্ঞতা লাভ করতেন না। আর তা হলে পটাশগড়ের জঙ্গলটাও তাঁর কাছে অজানা থেকে যেত। জয়পতাকাবাবু নিরুদ্দেশ না হলে স্কুল কাল বন্ধ দেওয়া হত না। এবং আগামী কাল ভুতুকে জয়পতাকার ক্লাসে অঙ্কের জন্য বিস্তর নাকাল হতে হত। সুতরাং সব দিক ভেবে দেখলে, যা হয়েছে তা ভালই হয়েছে। এরকম একখানা কাণ্ড হওয়ার দরকার ছিল।

ভুতু ঘোষবাড়ির ছেলে বটে তবে তার নিজের মা-বাবা নেই। ঘোষবাড়ির বড় সংসার। সকলেই লেখাপড়ায় ভাল, ভুতুর কাকা-জ্যাঠারা রীতিমত কৃতী মানুষ। কিন্তু সেই বাড়ির ছেলে হয়ে ভুতু বছর-বছর পরীক্ষায়

গাড্ডা খায়। এক বিধবা পিসির কাছেই ভুতু মানুষ। সবাই বলে, পিসির লাই পেয়ে পেয়ে ভুতুর আজ এই দশা। দুষ্টুমির জন্য কুখ্যাতি তো তার আছেই। ফলে বাড়ির কেউ ভুতুকে সুনজরে দেখে না। ভুতু মারপিট করে বেড়ায়, গাছ বায়, ক্লাস পালিয়ে ঘুরে বেড়ায়, আজেবাজে ছেলেদের সঙ্গে মেশে। গুণের মধ্যে, সে খেলাধুলোয় বেশ ভাল। প্রাইজটাইজ মেলাই পায়।

কাণ্ডখানা করে সে বেশ খুশি ছিল। কালুকে খেলার মাঠে লেলিয়ে দেওয়ায় খেলা তো কিছুক্ষণের জন্য পণ্ড হয়েছেই, তার ওপর টিমে ভুতু না থাকায় স্কুল গো-হারা হেরেছে।

ভুতু সন্ধের পর বই খুলে পড়ার ঘরে বসে বসে কাণ্ডখানা ভাবছিল আর ফিচিক-ফিচিক হাসছিল।

এমন সময় মেজো জ্যাঠামশাই ডেকে পাঠালেন। ভীষণ রাগী লোক। রাশভারীও বটে।

জ্যাঠামশাই অত্যন্ত গম্ভীরভাবে কয়কেজন লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাদের বিদেয় করে দিয়ে ভুতুর দিকে তাকিয়ে জলদগম্ভীর গলায় বললেন, "তুমি আজ যা করেছ তার জন্য কোনও শাস্তিই তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়।"

ভুতু একটু অবাক হল, ভয়ও পেল।

জ্যাঠামশাই বললেন, "তুমিই সেই কালপ্রিট, যে কালুকে খেপিয়ে নিয়ে খেলার মাঠে ছেড়ে দিয়েছিলে। অনেকেই সেটা স্বচক্ষে দেখেছে। তোমার এই দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজের ফলে তোমাদের মাস্টারমশাই জয়পতাকার কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে, কালু তাঁকে নিয়ে গিয়ে পটাশগড়ের জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এসেছে। ওই জঙ্গল খুবই বিপজ্জনক জায়গা। তাঁর প্রাণ যাওয়াও বিচিত্র নয়। তার ওপর কালু তাঁকে কোন অবস্থায় ফেলে দিয়ে এসেছে তাও আমরা বুঝতে পারছি না।"

ভুতু অত্যন্ত ক্ষীণ গলায় বলল, "জয়পতাকাসার যে ওরকম কাণ্ড করবেন তা আমি জানতাম না।"

"কিন্তু এ তো জানতে যে কালুকে ওই ভিড়ের মধ্যে ছেড়ে দেওয়ার ফলে বহু লোকের চোট হতে পারত!"

"আজ্ঞে, আমার ভুল হয়েছে।"

"ওটুকু বললেই যথেষ্ট বলা হল না। তুমি যেমন লোকের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিলে, জয়পতাকাবাবু তেমনই লোকের উপকার করার জন্য বীরের মতোই এগিয়ে গিয়েছিলেন। সারা শহরে এখন তাঁর গুণগান হচ্ছে। আর তোমার নামে লোকে ধিক্কার দিচ্ছে। ছিঃ ছিঃ। তোমার জন্য কাল থেকে আমাদের মুখ দেখানোর জো নেই।"

খবর পেয়ে পিসি ছুটে এল। বলল, "ও ভাই গোবর্ধন, আমার ভুতু কি আর অত ভেবেচিন্তে কিছু করেছে? ছেলেমানুষ, একটা দুষ্টুমি করে ফেলেছে। ওকে ছেড়ে দে।"

গোবর্ধনাবাবু অতিশয় গম্ভীর হয়ে বললেন, "তোমার জন্যই তো ওকে মানুষ করা গেল না মেজদি। তোমার ভয়ে ওকে শাসন করা আমরা একরকম ছেড়েই দিয়েছি। ফলে কী হয়েছে জানো? স্পেয়ার দি কেন অ্যান্ড স্পয়েল দা চাইল্ড।"

পিসি এক গাল হেসে বলল, "আমিও তো সেই কথাই বলি। এসপার দিয়ে কেন, ওসপার দিয়ে চলো। তা কি আর ও শোনে?"

জ্যাঠা গম্ভীরতর হয়ে বললেন, "তাই বললুম বুঝি?"

"তাই বললি না? নিজে কানে শুনলুম যে। তবে তুই ইংরেজিতে বললি আমি বাংলা করে নিলুম।"

জ্যাঠামশাই খুব হতাশ হয়ে ভুতুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "জয়পতাকার জন্য একটা দায়িত্ব আমাদের আছে। বিশেষ করে যখন তুমিই এ ব্যাপারটার মূলে আছ। শুনলুম, আগামীকাল ব্যোমকেশবাবু জয়পতাকার একটা সংবর্ধনাসভা করবেন বলে ঠিক করেছেন। কিন্তু জয়পতাকাকে খুঁজে পাওয়া না গেলে ওটাকে উনি কনডোলেন্স মিটিং বলেও ঘোষণা করতে পারেন। ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে দেখেছ?"

"যে আজ্ঞে।"

"আর এই সবকিছুর মূলেই তুমি। পটাশগড়ের জঙ্গল যদি ভয়াবহ জায়গা না হত, তা হলে আমি তোমাকে সেখানে পাঠাতুম। কিন্তু সেটা অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ হবে। জেনেশুনে তোমাকে বাঘ-ভালুকের সামনে ঠেলে দিতে পারি না। তা ছাড়া ওটা রহস্যময় জায়গাও বটে। রাতবিরেতে অত্যন্ত মিস্টিরিয়াস আলো দেখা যায়। আমি নিজেও দেখেছি দূর থেকে। সুতরাং ভেবে পাচ্ছি না কী করা উচিত।"

পিসি সঙ্গে-সঙ্গে বলে ওঠেন, "মিষ্টি কী রে? পটাশগড় বড্ড তেতো জায়গা। বাঘ-ভালুক ভূত-প্রেত রাক্ষস-খোক্কস ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী গোরিলা-সিংহ জিন-পরী সব আছে। সন্ধের পর ও জায়গার নামও উচ্চারণ করতে নেই। রাম রাম রাম রাম।"

"দ্যাখো দিদি, তুমি তো রাম নাম করে বেঁচে গেলে, কিন্তু ওদিকে জয়পতাকার কী হবে তা ভেবে দেখেছ?"

"ও আর ভাবব কী? জয়পতাকাই কি কাজটা ভাল করেছে? কালু হল শিবের ষাঁড়। স্বয়ং মহাদেব যে-পিঠে চাপেন, সেখানে বসাটাও কি আস্পর্দ্ধা নয়? তা যার যেমন কর্ম তেমনই তো ফল হবে। শিবরাত্তিরে কালুকে কত লোক ভোগ দেয় জানিস? কত টাকাপয়সা ছুঁড়ে দেয় কালুর পায়ে? বৈতরণী পার হতে গেলে কালুর লেজ ছাড়া আমাদের গতি আছে? সেই কালুর পিঠে জয়পতাকা কোন সাহসে চাপে শুনি?"

গোবর্ধন আর কথা বাড়ালেন না। বাড়িয়ে লাভও নেই। তিনি ভুতুর দিকে চেয়ে বললেন, "নিজের অন্যায়টা বুঝবার চেষ্টা করো গে। আর জয়পতাকা যদি প্রাণ নিয়ে ফেরে, তবে তার কাছে গিয়ে একবার ক্ষমা চেও।"

ভুতু যখন রাত সাড়ে-আটটা নাগাদ খেয়ে বিছানায় গেল তখন তার মনটা অন্যরকম হয়ে গেছে। চোখ দুটো ভারী-ভারী লাগছে, বুকটা ভার ঠেকেছে। জয়পতাকাবাবুর কাছে ক্ষমা চাইতে সে রাজি। কিন্তু ক্ষমা করার জন্য জয়পতাকা যে ফিরবেন তার ঠিক কি?

ভুতুর যত দোষই থাক, তাকে কেউ ভীতু বলতে পারবে না। পটাশগড়ের জঙ্গলের যত বদনামই থাক, ভুতু সেখানে প্রায়ই দুপুরবেলা যায়। ভারী নির্জন জায়গা। বুনো কুল আর বনকরমচা পাওয়া যায় শীতকালে। টক-মিষ্টি ভারী সুন্দর স্বাদ। ভুতু একা-একা ওই জঙ্গলে অনকে ঘুরে বেড়িয়েছে। তার অত ভয় নেই।

খানিকক্ষণ শুয়ে থেকে ভুতু বুঝল যে, তার ঘুম আসবে না। মাথাটা বড্ড গরম। সে উঠে পড়ল। পাশের খাটে পিসি অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তবে বাড়িতে বড়রা অনেকেই জেগে আছে। ঠাকুর-কাজের লোক রাতে খাওয়ার পর সাফাইয়ের কাজ করছে।

ভুতু একটা সোয়েটার পরে নিল। সঙ্গে নিল স্কাউট-ছুরি। দরজা খুলে ভুতু বেরোল। তারপর চারদিক দেখে নিয়ে নিজস্ব সাইকেলটা চালিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

পটাশগড়ে দিনের বেলা এলেও রাতে কখনওই আসেনি। কাঠের পোলের ওপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে ভুতু নদীটা পেরিয়ে পটাশগড়ের অন্ধকার, নিঝুম, ঝিঁ-ঝিঁ-ডাকা জঙ্গলের সামনে পৌঁছে গেল। ভয়-ভয় ভাবটা

শুরু হয়ে গেল। এই অন্ধকার জঙ্গলে ঢোকা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? আর এখানে কী করেই বা খুঁজে পাবে জয়পতাকাবাবুকে?

সাইকেলটা মাটিতে শুইয়ে রেখে ক্ষণকাল মাত্র দ্বিধা করল সে। তারপর দৃঢ় পায়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

ঢুকতেই সে একটা হরিণের মর্মন্তুদ আর্তনাদ শুনতে পেল। সঙ্গে চাপা একটা গরগর আওয়াজ। বাঘের ডিনার শুরু হল। ভুতু স্কাউট-ছুরিটা বাগিয়ে ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। এগোতে সাহস হল না। তারপর সব আবার চুপচাপ আর নিঝুম হয়ে গেল, সে ধীরে-ধীরে এগোতে লাগল। পটাশগড়ের জঙ্গল সামনের দিকটা তেমন ঘন নয়। কিন্তু গভীর জঙ্গল ভীষণ ঘন। চলাই মুশকিল। পাতলা জঙ্গলের মধ্যে একটু জ্যোৎস্না পড়েছে। আবছা আলোয় চারদিকটা আরও গা-ছমছম-করা। কিন্তু সাহস না করতে পারলে জয়পতাকাবাবুকে খুঁজে বের করা আরও কঠিন হবে।

হঠাৎ একটা টর্চের আলো তার ওপর ঝলক তুলে সরে গেল। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, "ওই একটা বাচ্চা ভূত! বাবা গো!"

চমকে উঠেও গলাটা চিনল ভুতু। ব্যোমকেশবাবু।

আর একজন গম্ভীর গলায় বলল, "ভূত যদি এত শস্তা হত, তা হলে আর ভাবনা ছিল না হে ব্যোমকেশ।"

এ-গলাটাও চেনে ভুতু। এ-হল শ্যাম লাহিড়ী।

আর-একটা লোক বলল, "যাই হোক, ব্যোমকেশ কিছু একটা দেখেছে। সেটা জয়পতাকাও হতে পারে তো! চলো দেখি।"

এ-গলা জয়ধ্বনির।

ভুতু প্রমাদ গুনল। আজ যে কাণ্ড সে করেছে তা সকলেই জেনে গেছে। লোকে তার সুনাম করছে না। এখন ধরা পড়লে বিপদ আছে।

সুবিধে হল এই গহিন জঙ্গলে গা-ঢাকা দেওয়ার মতো জায়গার অভাব নেই। ভুতু নিচু হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে অন্যদিকে সরে যেতে লাগল। নিরাপদ দূরত্বে এসে ফের সোজা হল।

আর সোজা হয়েই সে দেখতে পেল, সামনে একটা জলা। খুব চওড়া। চাঁদের আলোয় জলটা ঝিকমিক করছে। জলার ধারে এর আগেও এসেছে ভুতু। তবে রাত্তিরে জলাটা অন্যরকম দেখাচ্ছে। যেন সত্যি নয়, যেন স্বপ্ন-স্বপ্ন।

এই জলায় বাঘে জল খায়। অন্য সব বন্যপ্রাণীও আসে। কাদায় তাদের গভীর পায়ের ছাপ জ্যোৎস্নাতে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। এখানে গাছপালা না থাকায় চাঁদের আলো বেশ ফটফট করছে।

হঠাৎ ভুতু একটা পায়ের ছাপ লক্ষ্য করে চমকে গেল। নিচু হয়ে দেখল, মানুষের পায়ের ছাপই বটে। জয়পতাকাবাবু যদি জলায় নেমে থাকেন, তবে তো ভুতুকেও নামতেই হয়। আশায় ভরসায় ভয়টয় চলে গেল ভুতুর। জয়পতাকাবাবুর পায়ের ছাপ যখন পাওয়া গেছে, তখন জলার ওপাশে তাঁকে পাওয়া অসম্ভব নয়।

জলায় জোঁক আছে এবং ঢোঁড়া সাপ আছে। কিন্তু ভুতু সেসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। ঘপাস করে কাদায় নেমে পড়ল। হুপহুপ করে একটা হনুমান বড় গাছের মগডালে খানিক লাফালাফি করল। বোধহয় ভালুকটালুক

দেখেছে। বাঘও দেখে থাকতে পারে। জলার ধারে ওরা তো আসবেই।

জলা পেরোতে অনকেটা সময় লাগল। ডাঙাজমিতে উঠে ভুতু তার ভেজা প্যান্ট থেকে যতটা পারে জল ঝরিয়ে নিয়ে চারদিকে চেয়ে দেখল। এবার আরও নিবিড় জঙ্গল। এদিকটায় ভুতু কখনও আসেনি। এ-পাড়ে আর পায়ের ছাপ খুঁজে পেল না সে।

ডালপালা লতা-পাতায় নিশ্চিদ্র অরণ্য। এগোনো ভারী শক্ত।

পায়ের ছাপ আর খুঁজে না পেয়ে ভুতু দমে গেল বটে, কিন্তু ক্ষীণ আশা ছাড়ল না।

"সার! জয়পতাকা সার!" বলে দু'বার বেশ জোরে ডাকল ভুতু।

আর তখনই হঠাৎ হা হা করে একটা বাতাস বয়ে গেল। সেই বাতাসে পরিষ্কার শব্দ শোনা গেল, "ডিনার শেষ। ফিরে যাও।"

ভুতু দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাল। ডিনার শেষ! এর মানে কী? কে তাকে ফিরে যেতে বলছে? ভূত নাকি?

ভুতু আবার এগোতে গেল। আবার একটা পাগলাটে দমকা হাওয়া বলে গেল, "ফিরে যাও, ফিরে যাও, ডিনার শেষ।"

ফের ভুতু থমকে দাঁড়াল, এ-কার অশরীরী কণ্ঠস্বর। এ তো বাতাসের শব্দ নয়! বাতাসের সঙ্গে কে যেন মিশিয়ে দিচ্ছে কথা। তাকে ফিরে যেতে বলছে কেন? 'ডিনার শেষ', একথাটার মানেই বা কী?

ভুতুর আর যাই দোষ থাক, সে ভীতু নয়। সে ডানপিটে আর একগুঁয়ে। স্কাউট-ছুরিটা খুলে নিয়ে সে শক্ত করে ধরল, তারপর এগোতে লাগল। এত দূর এসে ফিরে যাওয়ার মানেই হয় না। তা ছাড়া জয়পতাকাবাবুর খবর না নিয়ে সে ফিরবেও না।

জলার এ-পাশের জঙ্গল অনকে বেশি ঘন। গাছপালার এত জড়াজড়ি যে, পথ করে এগোনো ভীষণ শক্ত। দিক নির্ণয় করা অসম্ভব। জঙ্গলের ভিতরে ঢোকার পর চাঁদের আলো মুছে গিয়ে নিবিড় অন্ধকার। সোজা হয়ে ভুতু এগোতে পারছে না। সে কখনও চলছে গুড়ি মেরে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে, কখনও সাপের মতো বুক ঘষটে। এইভাবে কতক্ষণ এগিয়েছে এবং কতটা, তা তার হিসেব নেই। কিন্তু হঠাৎ সে গাছপালা ভেদ করে একটা ছোট্ট খোলা জায়গায় এসে পড়ল। অনকেটা বড় একটা উঠোনের মতো জায়গা। বড়-বড় ঘাস আছে, আর কিছু ঝোপঝাড়। সে হঠাৎ দেখতে পেল, একটা ভালুক মস্ত একটা গাছ থেকে তরতর করে নেমে এল। বোধহয় ফল বা মৌচাক ভেঙে মধু খেতে উঠেছিল। নেমে ভুতুর মতোই সে ফাঁকা জায়গাটার ওপাশে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবখানা যেন উঠোনটা পেরিয়ে সে এদিকে আসবে। ভুতু ভালুকটার মুখোমুখি পড়তে চায় না বলে দাঁড়িয়ে রইল। আর জ্যোৎস্নায় ভালুকটার গতিবিধি লক্ষ কতে লাগল।

ভালুকটা কিন্তু সরাসরি উঠোনটা পেরোল না। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফাঁকা জায়গাটার দিকে চেয়ে রইল। তারপর বাঁ দিকে ঘুরে টলতে টলতে ঝোপঝাড় ভেঙে অনকেটা ঘুরে এপাশে এসে ভুতুর কয়কে হাত দূর দিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল।

ব্যাপারটা লক্ষ করে ভুতু একটু অবাক হল। সামনে বড়-বড় সবুজ ঘাসে ঢাকা চমৎকার চাতালটা কেন পেরোল না ভালুক-ভায়া?

ভাবতে ভাবতেই ভুতু আর-একটা কাণ্ড দেখল, এক পাল হরিণ তাদের দিঘল পায়ে কোথা থেকে এসে তার খুব কাছেই চাতালটার সামনে থমকে দাঁড়াল, এবং তারপর অবিকল ভালুকটার মতোই সাবধানে ডান

দিকে ঘুরে ঝোপঝাড় ভেঙে ওপাশের জঙ্গলে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর-একটু দাঁড়িয়ে থেকে ভুতু লক্ষ করল, কোনও বন্যপ্রাণীই চাতালটাকে পছন্দ করে না বা ভয় পায়। সে অন্তত দশ-বারোটা শেয়ালকেও একইরকম অদ্ভুত আচরণ করতে দেখল।

চাতালটায় কী আছে? এমনিতে তো সাধারণ একটা খোলা জায়গা বলেই মনে হয়, ভুতু চাতালটার খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর সাবধানে পা বাড়াল, কিন্তু নামতে পারল না। একটা বাধা পাচ্ছে, কিসের বাধা তা সে বুঝতে পারল না। কোনও দেয়াল নেই, কাচ নেই, বেড়া নেই, অথচ একটা অদৃশ্য বাধা। পা বা হাত কিছুতে ঠেকেছে না, অথচ চেষ্টা করেও ভুতু খোলা জায়গাটায় নামতে পারল না।

ভারী অবাক হল সে। কেন নামতে পারছে না? কেন বন্যপ্রাণীরাও জায়গাটাকে এড়িয়ে যাচ্ছে? বাধাটা কিসের?

আবার একটা বাতাস হাহা করে বয়ে গেল খোলা জায়গাটা দিয়ে, "ফিরে যাও। ফিরে যাও, নইলে বিপদ।"

ভুতু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রাগে, "কিসের বিপদ? আমি বিপদকে ভয় পাই না।"

"ডিনার শেষ। ডিনার শেষ।"

"কে আপনি, সামনে এসে দাঁড়ান।"

কোনও জবাব নেই।

অগত্যা ভুতু বন্যপ্রাণীদের মতোই অনকেটা ঘুরে চত্বরটা পার হল। তারপর আবার জঙ্গলে ঢুকল। তাকে চমকে দিয়েই হঠাৎ নীলচে আলোয় চারদিক ভরে গেল। ভারী মায়াবী নরম আলো। স্বপ্নের মতো। সেই আলোয় তার চারদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। নিবিড় অরণ্যের সবকিছু স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল।

ভুতু টের পেল আলোর উৎস তার পিছন দিকে, ওই চত্বরে।

ভুতু চত্বরটার দিকে দৌড়ে ফিরে গেল।

কিন্তু সে যখন পৌঁছল, তখন আলো নিভে গেছে। চত্বরটা আগকোর মতোই ফাঁকা আর নির্জন। ভুতু কিছুক্ষণ অপক্ষা করল। তারপর আবার ঘুরে তার পথে এগোতে লাগল।

জয়পতাকা যে খাদটার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন, ভুতুও সেটার মধ্যে পড়ে যেতে পারত। তবে একেবারে শেষ মুহূর্তে শূন্যে পা ফেলেও সে টাল সামলে নিতে পারল। আর পারল সে একজন ভাল খেলোয়াড় বলেই।

খাদের ধারে দাঁড়িয়ে ভুতু একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চারদিকে তাকাল। এগোনোর আর কোনও উপায় নেই, যদি না খাদটা কোনওক্রমে পেরনো যায়।

কাছেপিঠে কোথাও একটা খ্যাপা বাঘ গর্জন করে উঠল হঠাৎ। ভুতু অত্যন্ত তড়িৎগতিতে কাছে যে-গাছটা পেল, তাতে উঠে পড়ল। অনকেটা উঁচুতে উঠে সে চারদিকে তাকিয়ে দেখল। খাদের ওপার আর এপারের গাছের ডালপালা পরস্পরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। খাদটা গভীর হলেও চওড়া নয়। সাহস করে এক ডাল থেকে অন্য ডালে ঝুল খেয়ে যাওয়া যায়। যে-ই কথাটা সে ভেবেছে, অমনি একটা হুতোম প্যাঁচা 'ভুত-ভুতুম, ভূত-ভুতুম' করে ডেকে তাকে সমর্থন জানাল।

সন্তর্পণে ভুতু একটা লম্বা ডাল বেয়ে এগোতে লাগল। ওপাশের একটা গাছের ডাল মাত্র হাত-দুয়কে দূরে নুয়ে আছে। ভুতু চোখ বুজে নিজের বিপজ্জনক অবস্থাটা খানিকটা বুঝে নিল। হাত বাড়িয়ে সে ডালটা নাগালে

পাবে না। তবে এ-ডাল ছেড়ে যদি লাফিয়ে পড়ে তবে কপালজোরে ও-ডালটা ধরলেও ধরে ফেলতে পারে। কাজটা অবশ্য খুবই বিপজ্জনক। নিচে অতল খাদ হাঁ করে আছে।

ভুতু সাহস সঞ্চয় করে নিল। যা হওয়ার হবে। এ-এলাকায় সে হল গাছ বাওয়ার চ্যাম্পিয়ন। যে ডালটায় সে বসে আছে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হওয়ার মতো, সেটা ধরে সে ঝুলে পড়ল। তারপর শরীরটাকে একটু দুলিয়ে সে নিজেকে ছুঁড়ে দিল।

বাঁ হাতটা ফসকাল। কিন্তু পড়তে পড়তেও ডান হাতে সে ডালটা পেয়ে গেল। তার ভারে ডালটা এত নুয়ে গেল যে, একবার মনে হল ভেঙে পড়ে যাবে।

ভাঙল না, নুয়ে ফের উঠে গেল ওপরে। ভুতু কিছুক্ষণ ঝুলে থেকে খুব সন্তর্পণে ডাল বেয়ে গাছের মূল শাখাপ্রশাখায় পৌঁছে গেল।

গাছ থেকে নেমে যখন সে ফের মাটির ওপর দাঁড়াল, তখন তার ঘাম হচ্ছে পরিশ্রমে। কিন্তু থামলে তো চলবে না। জয়পতাকাবাবুর যদি কিছু হয়ে থাকে তবে সে-ই তো দায়ী।

বালিয়াড়িটার কাছাকাছি এসে পৌঁছতে আরও খানিকক্ষণ সময় লাগল তার। যখন পৌঁছল তখন নিশুত রাতের উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় চারদিক ভারী অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

বাতাসে একটা কণ্ঠস্বর ফের হাহাকার করে উঠল, "ডিনার শেষ। ডিনার শেষ।"

ভুতু বালিয়াড়ির মাঝখানে ধ্বংসস্তূপটার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলল, "কিসের ডিনার?"

কেউ জবাব দিল না।

ভুতু বালিয়াড়ির দিকে পা বাড়াল। সে এই জঙ্গলে চোরাবালি আছে বলে শুনেছে। এই সেই চোরাবালি নয় তো? সে একটা মরা গাছের ডাল কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে দেখল, ভুশ করে ডুবে যায়। তা হলে এই সেই চোরাবালি? কিন্তু ওই ধ্বংসস্তূপের ভিতরে সব রহস্যের সমাধান আছে—এরকম মনে হচ্ছিল তার।

সে জঙ্গলের মধ্যে চারপাশটা খুঁজে একটা শক্ত আর লম্বা ডাণ্ডা জোগাড় করে ফেলল। তারপর ডাণ্ডাটা বালির মধ্যে গুঁজে কতটা গভীর তা মেপে দেখার চেষ্টা করল। ডাণ্ডাটা সম্পূর্ণই ঢুকে গেল ভিতরে, কোথাও

ঠেকল না।

কিন্তু ধৈর্য হারাল না সে। ওখানে যখন ধ্বংসস্তূপ আছে, তখন পথও নিশ্চয়ই ছিল। সেটা খুঁজে বের করতে হবে।

সেই হাহাকার আবার বলে গেল, "পথ নেই। পথ নেই।"

ভুতু তবু ডাণ্ডাটা দিয়ে বালিয়াড়ির বিভিন্ন জায়গায় খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ তার মনে হল, পিছনে কে যেন এসে দাঁড়িয়ে আছে। সে ঘুরে তাকাল। কেউ নেই। কিন্তু যেই আবার খোঁচাখুঁচি শুরু করল, তখনই স্পষ্ট টের পেল, পিছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে লক্ষ করছে। হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস যেন পড়ল।

ভুতুর গায়ে একটু কাঁটা দিল। স্কাউট-ছুরিটা বাগিয়ে ধরে সে বিদ্যুৎ-বেগে ঘুরে দাঁড়াল, কেউ নেই। কিন্তু তবু যেন মনে হচ্ছে, কেউ আছে। সামনেই একটা মানুষ-সমান উঁচু ঝোপ। ভুতু এগিয়ে গিয়ে ঝোপটার গায়ে ডাণ্ডা দিয়ে কয়কেটা ঘা বসাল। তিন ঘা বসানোর পর চতুর্থবার লাঠিটা যেই তুলেছে, অমনি হঠাৎ তার হাত থেকে কে যেন এক মোচড়ে লাঠিটা কেড়ে নিল।

তারপর যে ঘটনা ঘটল তা চোখে দেখলেও বিশ্বাস হয় না। ভুতু দেখল, তার হাত-ছাড়া লাঠিটা শূন্যে লম্বমান হয়ে ঝুলে আছে। তারপর লাঠিটা ধীরে দুলতে দুলতে বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে ভেসে-ভেসে চলে যেতে লাগল। আর লাঠিটার সঙ্গে-সঙ্গে বালির ওপর ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় পায়ের ছাপ ফুটে উঠতে লাগল।

ভুতুর গায়ে কাঁটা দিল। মাথা ঘুরে সে হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়েই যেত। অতি কষ্টে সে দাঁতে দাঁত চেপে, হাতে চিমটি কেটে নিজেকে ঠিক রাখল। দেখল লাঠিটা সেই ধ্বংসস্তূপে পৌঁছে ঝোপঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

স্তম্ভিতভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ভুতু। মাথাটা ধোঁয়াটে, বুকটা দুরদুর করছে। হাত-পা ঠাণ্ডা।

কিন্তু গোঁয়ারগোবিন্দ ডানপিটে ভুতু সহজে হার মানে না। সে ধীরে-ধীরে বালিয়াড়ির কাছে এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে পায়ের ছাপটা পরীক্ষা করল। মস্ত বড় পা, তবে আঙুল-টাঙুলের কোনও ছাপ নেই। হয়তো অদৃশ্য একজোড়া জুতো হেঁটে গেছে। বেশ গভীর ওজনদার ছাপ।

হঠাৎ ভূতোর ভয়ডর কেটে গেল। তার মনে হল, ওই ধ্বংসস্তূপে যাওয়ার পথ হয়তো এইটাই। কেউ তাকে হয়তো পথ দেখাচ্ছে। সে ভূত হলে হবে, ভুতুর তাতে আপত্তি নেই।

ভুতু প্রথম ছাপটার ওপর একটা পা রেখে দেখল, না দেবে যাচ্ছে না। সাহসে ভর করে সে ছাপটার ওপর দাঁড়াল, তারপর পরের পা রাখল পরের ছাপটার ওপর। তারপর এইভাবে ধীরে-ধীরে এগোতে লাগল। কপালে কিছু-কিছু ঘাম হচ্ছে। বুকটা দুরদুর করছে। গলা শুকিয়ে আসছে। তবু শেষ অবধি দেখতে হবে। তার খুব মনে হচ্ছে, জয়পতাকাবাবু নিরুদ্দেশ হয়েছেন ওই ধ্বংসস্তূপেই।

খুব ধীর পায়ে ভুতু এগোচ্ছিল। কিন্তু কেমন একটা অস্বস্তিও বোধ করছিল সে। কেবলই মনে হচ্ছে, সামনের ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে চোরা চোখে কেউ তাকে লক্ষ করছে।

হাহাকারের শব্দে বাতাসটা আর একবার বালিতে ঝড় তুলে বয়ে গেল। বলে গেল, "ফেরার পথ নেই। ফেরার পথ নেই। ডিনার শেষ।"

ঝড়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে চোখ ঢাকল ভুতু। বালির ঝাপটায় তার শরীর কন্টকিত হল। তারপর চোখ চেয়ে যা দেখল তা আতঙ্কজনক। বালির ঝড়ে সামনের ও পিছনের সব পদচিহ্ন মুছে গেছে। সে ঠিক মাঝ বরাবর

দাঁড়িয়ে।

ভুতু কী করবে তা প্রথমে বুঝতে পারল না। এক-পা এদিক-ওদিক হলেই বালিতে ডুবে মরতে হবে। কিন্তু অনন্তকাল তো দাঁড়িয়ে থাকাও যাবে না।

ভুতু স্কুলের সেরা খেলোয়াড়। সে চমৎকার দৌড়তে পারে। যদি বাকি পথটুকু সে খুব জোরে দৌড়োয়, তা হলে হয়তো চোরাবালিতে ডুববার আগেই পৌঁছে যেতে পারবে ডাঙা জমিতে। কিন্তু মুশকিল হল, বালির ওপর জোরে দৌড়নো অসম্ভব।

ভুতুকে বিপদের ঝুঁকি নিতেই হবে। সে-জায়গায় দাঁড়িয়ে কয়কেবার জোড়পায়ে লাফিয়ে ওয়ার্ম আপ করে নিল। তারপর একশো মিটার দৌড়ে স্টার্ট নেওয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়াল। বুক ভরে দম নিল। তারপর চিতাবাঘের মতো দৌড় শুরু করল। প্রতি পদক্ষেপেই তার পা ক্রমে গ্রাস করে নিচ্ছে চোরাবালি, কিন্তু ভুতু সময় নিচ্ছে না। পরের বা বাড়িয়ে পেছনের পা টেনে নিয়ে প্রায় উড়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। শেষ কয়কে ফুট যখন বাকি তখন সে পড়ে গেল। কিন্তু পড়েই গড়াতে শুরু করল। তারপর কী হল মনে নেই।

জয়পতাকা সম্পর্কে একটা গুপ্ত খবর কেউ জানে না। তাঁর যখন পেটে খিদে চাগাড় দেয় তখন তিনি বোকা হয়ে যান, ভীতু হয়ে পড়েন, কী করছেন না করছেন তা তাঁর ভাল জানা থাকে না। পেট ভরা থাকলে তাঁর মাথা ভাল কাজ করে, তখন তিনি বেশ সাহসী হয়ে ওঠেন, এবং কী করছেন না করছেন তা চমৎকার বুঝতেও পারেন। কিন্তু যেদিন তিনি মনের মতো খাবার পরম আহ্লাদ ও তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে ওঠেন, সেদিন জয়পতাকার মাথা প্রায় আইনস্টাইনের সমকক্ষ হয়ে ওঠে, তিনি প্রচণ্ড সাহসী হয়ে পড়েন এবং দূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত দেখতে পান। তবে খাবারটা যতক্ষণ পেটে থাকে ততক্ষণ।

আজ দুপুরে যদি চমৎকার একটি ভোজ না খেতেন, তা হলে কি তিনি কালুর মতো দুরন্ত ও ভয়ঙ্কর ষাঁড়ের মুখখামুখি দাঁড়াতে পারতেন দুঃসাহসে ভর করে?

আবার এই পটাশগড়ের ডাইনিং হল-এ বসে একা যখন ভোজ্যবস্তুর ঢাকনা একে-একে খুলে খেতে শুরু করলেন, তখন খাবারের স্বাদে ও গন্ধে তাঁর গান গাইতে এবং নাচতেও ইচ্ছে করছিল। এত ভাল সব খাবার তিনি জন্মেও খাননি। প্রথমেই চিনেমাটির একটা বাটির ঢাকনা খুলে দেখলেন তাতে রয়েছে আলফাবেট স্যুপ। সোনালি রঙের সুরুয়ার মধ্যে লাল নীল সবুজ হলুদ মেরুন রঙের এ-বি-সি-ডি, অ-আ-ক-খ সব ভাসছে। চামচ দিয়ে উষ্ণ স্যুপ থেকে একটা এ-তুলে মুখে দিতেই তাঁর জিভ যেন আনন্দে উলু দিয়ে উঠল। স্যুপটা শেষ করে তিনি স্বর্গীয় স্বাদের আরও নানা খাবার চেখে এবং খেয়ে যেতে লাগলেন। মুশকিল হল, এসব খাবার তিনি জন্মেও খাননি। এসব কী ধরনের খাবার, তাও তিনি বুঝতে পারলেন না। আমিষ না নিরামিষ

তাও বুঝবার কোনও উপায় নেই। কিন্তু স্বাদ অতুলনীয়। যতই খেতে লাগলেন ততই ভয় কেটে যেতে লাগল, মাথা পরিষ্কার ও বুদ্ধি ক্ষুরধার হয়ে উঠতে লাগল, এবং তাঁর কী করা উচিত এবং উচিত নয়, তা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, এখন তাঁর এক নাগাড়ে খেয়ে যাওয়া উচিত। তিনি কোনওদিকে না তাকিয়ে মাথা নিচু করে খেয়ে যেতে লাগলেন।

প্রায় চল্লিশ মিনিট খাওয়ার পর বুঝলেন, তাঁর পেট খুবই আপত্তি জানাচ্ছে। হাউস ফুল। আর কিছুর ঢুকবার জায়গা নেই। জয়পতাকা একটা বড় একটা মেজো এবং ছোট ঢেকুর পর্যায়ক্রমে তুললেন। তারপর একটা শ্বাস ফেলে বললেন, "না, ব্যবস্থা দেখছি ভালই। এরা খাওয়াতে জানে।"

ডাইনিং হল-এর এক কোণে ঝকঝকে বেসিন, র‍্যাকে ধপধপে তোয়ালে। জয়পতাকা আঁচিয়ে মুখ মুছে একটু তৃপ্তির হাসি হাসলেন। ভয়ডর কেটে গেছে। কৌতূহল বাড়ছে। বুদ্ধিও কাজ করছে।

চারদিকটা একটু সরেজমিনে দেখার জন্য তিনি ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে একটা লম্বা দর-দালানের মতো জায়গায় ঢুকে পড়লেন। ডান দিকে একটা বেশ বড় ঘর। সবুজ কার্পেট দিয়ে মোড়া ঘরখানায় উজ্জ্বল ঝাড়বাতি জ্বলছে। চারদিকে চেয়ার-টেবিল সাজানো, টেবিলে টাটকা ফুলের তোড়াওয়ালা মস্ত রুপোর ফুলদানি। ভিতর থেকে পিয়ানোর ভারী মিষ্টি আওয়াজ আসছে। জয়পতাকা ঘরে ঢুকে একটা কৌচে বসে পড়লেন। পিয়ানোর সামনে একটা টুল পাতা। তাতে কেউ বসে নেই। কিন্তু টুং-টাং করে পিয়ানো বেজে যাচ্ছে। খানিকক্ষণ পিয়ানো শোনার পর তিনি জায়গাটা আরও একটু ঘুরে দেখবেন বলে দর-দালান ধরে এগোলেন। পরের ঘরটা ইনডোর গেমসের ঘর। সেখানে টেবিল টেনিস, ক্যারম, দাবার ছকের বিভিন্ন টেবিল রয়েছে।

জয়পতাকা প্রথমে টেবিল টেনিসের ব্যাট তুলে নিলেন। অমনি শূন্য থেকে একটা পিংপং বল টুক করে টেবিলে এসে পড়ল। জয়পতাকা প্রতিদ্বন্দ্বিহীন। বলটা সার্ভ করলেন আনমনে। কিন্তু চমকে উঠে দেখলেন ওপাশে ব্যাটটা শূন্যে উঠে তাঁর সার্ভটাকে স্ম্যাশ করে ফেরত পাঠাল। কে যেন বলে উঠল, "লাভ ওয়ান।"

জয়পতাকা বেকুবের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বলটা কুড়িয়ে নিলেন। ভজুরাম মেমোরিয়াল স্কুলে তিনি প্রায়ই কমনরুমে গিয়ে টেবিল টেনিস খেলেন। বেশ ভালই খেলেন। কাজেই তাঁর জেদ চেপে গেল। ওপাশে ব্যাটটা শূন্যে ঝুলছে, দুলছে, খুব হিসেব কষে জয়পতাকা বেশ জুতসই আর-একটা সার্ভ করলেন। বলটা সঙ্গে-সঙ্গে মার খেয়ে বিদ্যুৎবেগে ফিরে এল এবং টেবিল ছুঁয়েই শাঁ করে গিয়ে দেওয়ালে লাগল।

সেই কণ্ঠস্বর বলে উঠল, "লাভ টু।"

জয়পতাকা এবার খুব কোণাচে একটা চমৎকার সার্ভ পাঠালেন ওপাশে। বলটা ফিরে এল বটে, কিন্তু জয়পতাকা সেটাকে ব্লক করলেন। কিন্তু ফেরত আসা চাপটা আর আটকাতে পারলেন না।

"লাভ থ্রি।"

খেলা চলতে লাগল। তবে একতরফা। দশ মিনিটের মাথায় লাভ গেম খেয়ে জয়পতাকা বিক্তির সঙ্গে ব্যাটটা রাখলেন। ওপাশের ব্যাটটাও টেবিলে শুয়ে পড়ল।

দাবা খেলা তাঁর খুবই প্রিয়। ঘুঁটি সাজানো আছে দেখে তিনি সাদা ঘুঁটির দিকে বসে মন্ত্রীর ঘরের বোড়েটা দু'ঘর এগিয়ে দিলেন। ওপাশ থেকে রাজার ঘরের বোড়ে টুক করে দু'ঘর এগিয়ে এল। জয়পতাকা মগ্ন হয়ে

গেলেন খেলায়। প্রতিপক্ষ অতিশয় শক্ত। মাত্র বারো চাল খেলার পরই তিনি বুঝতে পারলেন, এঁটে উঠছেন না। পরের চালেই প্রতিপক্ষের কালো গজ একটা বোড়ে খেয়ে রাজার সোজাসুজি বসে গেল।

সেই স্বর বলে উঠল, "কিস্তি।"

দু'চাল পরে মাত হয়ে উঠে পড়লেন জয়পতাকা। ক্যারমও তিনি ভালই খেলেন। ঘুঁটি সাজানো আছে দেখে লোভ সামলাতে পারলেন না। কিন্তু শুরুতে স্ট্রাইক নিয়ে গোটা-তিনকে ঘুঁটি ফেললেও প্রতিপক্ষ একেবারেই একে-একে সব কালো ঘুঁটি পকেটস্থ করে দিল। তিন বোর্ডেই গেম খেয়ে জয় জয়পতাকা উঠে পড়লেন।

পরের ঘরটা লাইব্রেরি। মেঝে থেকে সিলিং অবধি চমৎকার কাঠের তাকে ঠাসা বই। কোণের দিকে একটা ইজিচেয়ার পাতা। তাতে কেউ নেই বটে, কিন্তু একখানা বই ভোলা অবস্থায় শূন্যে ভেসে আছে। ঠিক যেন ইজিচেয়ারে বসে কেউ বইটা পড়ছে। জয়পতাকা ঢুকতেই বইটা ধীরে বন্ধ হয়ে গেল এবং শূন্য দিয়ে ভেসে গিয়ে একটা তাকে বইয়ের ফাঁকে ঢুকে পড়ল।

জয়পতাকা তাক থেকে একখানা বই টেনে নিয়ে খুলে পড়তে লাগলেন। এবং পড়তে পড়তে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। এয়ারোডাইনামিক্সের ওপর যে এত সাঙ্ঘাতিক বই আছে তা তাঁর জানা ছিল না। কিন্তু দুটো পাতা ভাল করে পড়তে-না-পড়তেই কে যেন হাত থেকে বইখানা কেড়ে নিল। সেটা শূন্যে ভেসে ওপরের একটা তাকে গিয়ে সেঁধোল। জয়পতাকা আবার একখানা বই টেনে নিলেন। খুলে দেখলেন, সেটা মহাকাশতত্ত্বের ওপর অতি উন্নত গবেষণাধর্মী রচনা। কিন্তু এটাও দু-একপাতা পড়তে-না-পড়তেই বইটা তাঁর হস্তচ্যুত হল। কিন্তু যেটুকু পড়লেন তাতে তাঁর মাথা ঘুরে গেল। মহাকাশ-বিজ্ঞানের প্রায় অকল্পনীয় সব তত্ত্ব আর তথ্য রয়েছে বইটাতে। জয়পতাকা পাগলের মতো গিয়ে আর-একটা বই খুললেন। এটা শারীরবিদ্যার বই। কিন্তু যাদের শরীর নিয়ে লেখা তারা নিশ্চয়ই অতি মানুষ। বইটা হস্তচ্যুত হলে আর-একখানা বই খুলে জয়পতাকা দেখলেন, অঙ্কের বই। তবে সাধারণ অঙ্কের নয়, এই পৃথিবীর অঙ্কও নয়। এ একেবারে ধরাছোঁয়ার বাইরের সব অঙ্ক। যা দেখছেন জয়পতাকা তার কোনওটাই তাঁর বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। এই পৃথিবীতে বিজ্ঞান বা অঙ্ক এত উন্নতি করেনি আজও। তা হলে এই বইগুলো কে লিখল? কোথা থেকে জঙ্গলের মধ্যে এক ভুতুড়ে বাড়িতে এসে জুটল বইগুলো?

ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে গেল জয়পতাকার। হাত-পা থরথর করে কাঁপতে লাগল উত্তেজনায়। এতক্ষণ যা কিছু ঘটেছে তাতে ভয় বা উত্তেজনার কারণ ছিল বটে, কিন্তু জয়পতাকা তা গ্রাহ্য করেননি। কিন্তু এই লাইব্রেরিতে ঢুকে যা অভিজ্ঞতা হল, তাতে তাঁর আবার মাথা গুলিয়ে গেল। মাথা গুলিয়ে গেলেই তাঁর খিদে পায়। এবং খিদে পেলেই তিনি অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা শূন্য হয়ে পড়েন।

তিনি বড়-বড় চোখে চারদিকে চেয়ে অস্ফুট গলায় বললেন, "ভূত! ভূত! ভূত ছাড়া এসব আর কিছুই নয়। এসবই মায়া? চোখের ভুল! ভীমরতি? পাগলামি? চালাকি? ধোঁকাবাজি? জোচ্চুরি?"

আর-একটা বই তাক থেকে নিয়ে তাড়াতাড়ি খুললেন জয়পতাকা। জীবজন্তুবিষয়ক বই। অনকে ছবি। কিন্তু একটাও জীবজন্তু তিনি চিনতে পারলেন না। সবচেয়ে বড় কথা, জন্তুগুলি যে-সব বনভূমিতে বিচরণ করছে, তার গাছপালাও জয়পতাকার চেনা নয়। জন্তুদের নামগুলোও অদ্ভুত বলে মনে হল তাঁর।

বইটা যখন তাঁর হাত থেকে নিয়মমাফিক কেড়ে নেওয়া হচ্ছিল তখন জয়পতাকা সবলে বইটা চেপে ধরে বললেন, “দেব না! কিছুতেই দেব না।”

প্রাণপণে বইখানা বুকে আঁকড়ে দু'হাতে চেপে ধরে রইলেন জয়পতাকা। কিন্তু বইটা নিজেই যেন তাঁর হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য পাখির মতো ডানা ঝাপটাতে লাগল। ডানা বলতে আসলে দুটো মলাট। বইয়ের সঙ্গে কুস্তি করতে হবে একথা জয়পতাকা স্বপ্নেও কখনও ভাবেননি। কিন্তু সেই অমন কুস্তি আজ তাঁকে করতে হচ্ছে। প্রাণপণে চেপে ধরা সত্ত্বেও বইটা নিজেই যেন গোঁত খেয়ে একসময়ে ঠিকই বেরিয়ে গেল। আর তার ধাক্কায় মেঝের ওপর ছিটকে পড়ে গেলেন জয়পতাকা।

কোমরে বেশ ব্যথা পেয়েছেন। তবু ধীরে-ধীরে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। লাইব্রেরির চারদিকে অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে দেখতে লাগলেন। বই তাঁর সাঙ্ঘাতিক প্রিয় জিনিস। বিশেষ করে অঙ্ক আর বিজ্ঞানের বই। যিনি বই এত ভালবাসেন, তাঁর সঙ্গে বই কখনও কুস্তি করে? আবার ধাক্কা মেরে ফেলেও দেয়? ভারী দুঃখ হল তাঁর।

আর এই দুঃখেই তিনি লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে করিডোরে পড়লেন। পরের ঘরটা কিসের?

দরজা ঠেলতেই নিঃশব্দে খুলে গেল। বাঃ, চমৎকার শোয়ার ঘর। মস্ত খাটে নরম বিছানা পাতা। পাশে একটা টুলের ওপর সযত্নে ঢেকে রাখা এক গেলাস জল।

জয়পতাকা জলটা এক চুমুকে খেয়ে নিয়ে গেলাসটা রাখার সঙ্গে-সঙ্গেই গেলাসটা আবার জলে ভরে গেল, ঢাকনাটা আপনা থেকেই উঠে গেলাসটাকে ঢাকা দিয়ে দিল। জয়পতাকা আবার জলটা খেয়ে ফেললেন। আবার গেলাস জলে ভরে উঠল। ঢাকনা আপনা থেকেই ঢাকা দিল গেলাসের মুখ। তিনবারের বারও একই ঘটনা ঘটায় জয়পতাকা হাল ছেড়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমোবেন বলে তৈরি হতে লাগলেন। জামাকাপড় সবই তাঁর কাদামাখা এবং নোংরা। লাল সালুটা এখনও কোমরে গোঁজা। শোওয়ার ঘরের লাগোয়া একটা বাথরুম রয়েছে দেখে জয়পতাকা গিয়ে ঢুকলেন। কল খুলতেই এই শীতে ভারী আরামদায়ক জল পড়তে লাগল। আর সাবানখানার যা মনমাতানো গন্ধ, তা আর বলার নয়। বেশ করে মুখ-হাত-পা ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছে ঘরে আসতেই দেখলেন শূন্যে একটা পাজামা আর পাঞ্জাবি ভাসছে। জয়পতাকা জামা কাপড় পালটে নিলেন। তারপর বিছানায় শুয়ে সিলিং-এর দিকে চেয়ে রইলেন। যথেষ্ট ধকল গেছে। তাঁর তখন ঘুমনো উচিত। কিন্তু ঘুম আসছে না।

জয়পতাকা একটু এপাশ-ওপাশ করলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল, ঘুম তাঁর আর মোটেই আসবে না। শরীর যথেষ্ট ঝরঝরে। তাঁর মনে হচ্ছে, কোনও এক ফাঁকে তিনি অন্তত সাত-আট ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিয়েছেন। শরীর যথেষ্ট বিশ্রাম পেয়েছে। আর শুয়ে থাকার মানেই হয় না। কিন্তু কখন ঘুমোলেন তা তিনি মোটেই ভেবে পেলেন না। তবে তিনি বিছানা থেকে উঠে চটিজোড়া পায়ে দিয়ে বেরোতে গিয়েই থমকে দাঁড়ালেন। চটিজোড়া এল কোত্থেকে? অবশ্য ভেবে লাভ নেই। সব কিছুই তো শূন্য থেকেই আসছে। কোনও উপকারী ভূত নিশ্চয়ই। আর ভূত যদি উপকারীই হয় তবে তাকে খামোকা ভয় পাওয়ারও মানে হয় না।

কিন্তু চটিজোড়া পায়ে দিয়ে তাঁর একটু মুশকিল হল। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, তাঁর চটি দুটি একটু অবাধ্য এবং একগুঁয়ে। তিনি করিডোর দিয়ে ডান দিকে যেতে চাইছেন। কিন্তু চটি দুটি তা হতে দিল না। তাঁকে অন্য দিকে হাঁটতে বাধ্য করতে লাগল। এ-বাড়ির কিছুই জয়পতাকা চেনেন না। চটি যদি তাঁকে পথ দেখিয়ে

নিয়ে যায়, তো ক্ষতি কী? তিনি প্রথমে কয়কেবার চটি দুটিকে নিজের মতো চালানোর চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিলেন। চটি তাঁকে তাদের ইচ্ছেমতো নিয়ে যেতে লাগল। দর-দালান থেকে বেরনোর একটা দরজা খোলা রয়েছে। চটি তাঁকে সেই দরজা দিয়ে আর-একটা গলির মতো জায়গায় এনে ফেলল। গলিটা বেশ মসৃণ। একটা বাঁক খেয়ে ওপর দিকে উঠে গেছে। উঠতে বিশেষ পরিশ্রম করতে হল না জয়পতাকাকে। চটিজুতোই তাঁর পরিশ্রম ভাগাভাগি করে নিল।

একটা খোলা ছাদে এসে তিনি একটা পুরনো আমলের লম্বা ও সরু দূরবীনের সামনে থামলেন। বলা ভাল সেখানেই তাঁকে থামানো হল। এরকম দূরবীন আগেকার দিনে জাহাজের ক্যাপ্টেনরা ব্যবহার করতেন। জয়পতাকা দূরবীনে চোখ রাখলেন। চারদিকে ম্লান জ্যোৎস্নায় ভুতুড়ে বালিয়াড়ি, তার পরে ঘন জঙ্গল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তিনি দূরবীনের ভিতর দিয়ে স্পষ্ট এবং পরিষ্কারভাবে সব দেখতে পাচ্ছেন।

একটা খোলা ছাদে এসে তিনি একটা পুরনো আমলের লম্বা ও সরু দূরবীনের সামনে থামলেন। বলা ভাল সেখানেই তাঁকে থামানো হল। এরকম দূরবীন আগেকার দিনে জাহাজের ক্যাপ্টেনরা ব্যবহার করতেন। জয়পতাকা দূরবীনে চোখ রাখলেন। চারদিকে ম্লান জ্যোৎস্নায় ভুতুড়ে বালিয়াড়ি, তার পরে ঘন জঙ্গল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তিনি দূরবীনের ভিতর দিয়ে স্পষ্ট এবং পরিষ্কারভাবে সব দেখতে পাচ্ছেন।

একটা খোলা ছাদে এসে তিনি একটা পুরনো আমলের লম্বা ও সরু দূরবীনের সামনে থামলেন। বলা ভাল সেখানেই তাঁকে থামানো হল। এরকম দূরবীন আগেকার দিনে জাহাজের ক্যাপ্টেনরা ব্যবহার করতেন। জয়পতাকা দূরবীনে চোখ রাখলেন। চারদিকে ম্লান জ্যোৎস্নায় ভুতুড়ে বালিয়াড়ি, তার পরে ঘন জঙ্গল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তিনি দূরবীনের ভিতর দিয়ে স্পষ্ট এবং পরিষ্কারভাবে সব দেখতে পাচ্ছেন।

এই সামান্য আলোয় গাছপালা সব কালো দেখার কথা। কিন্তু জয়পতাকা গাছের সবুজ রংও দেখতে পাচ্ছিলেন। খুঁটিনাটি অনকে কিছুই তাঁর নজরে পড়ল। একটা হনুমান বসে-বসে ঘুমোতে-ঘুমোতে নিজের পেটটা খসখস করে চুলকে নিল। একটা কালো সাপ পাখির বাসায় ঢুকে পাখির ছানা গিলে ফেলল। একটা বাঘ নানা কথা ভাবতে ভাবতে একটা শিমুল গাছে গা ঘষটে নিয়ে একটা ঢেকুর তুলল।

দূরবীনটা খুবই শক্তিশালী তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু পৃথিবীতে যে এরকম দূরবীন আবিষ্কৃত হয়েছে সেটাই জয়পতাকার জানা ছিল না। অন্ধকারে দেখার জন্য ইনফ্রা রেড দূরবীন তৈরি হয়েছে, জয়পতাকা জানেন। কিন্তু তা দিয়ে এরকম পরিষ্কার দেখা সম্ভব নয়। অথচ এই দূরবীনটা দেখতে দাঁড়টানা জাহাজে ব্যবহৃত দূরবীনের মতো।

জঙ্গলের নানা দৃশ্য দেখতে দেখতে হঠাৎ জয়পতাকার চোখে পড়ল তিনজন বুড়ো মানুষ গুড়ি মেরে-মেরে ঝোপঝাড় ভেঙে এদিকেই আসবার চেষ্টা করছে। তিনজনকেই এক লহমায় চিনে ফেললেন জয়পতাকা। একজন তাঁর দাদু জয়ধ্বনি, একজন পুরপিতা ব্যোমকেশবাবু, তৃতীয়জন শ্যাম লাহিড়ী। সবার আগে শ্যাম লাহিড়ী, তাঁর পিছনে ব্যোমকেশ, তাঁর পিছনে জয়ধ্বনি এবং জয়ধ্বনির পিছনে একটা ডোরাকাটা বাঘ। বাঘটাকে জয়ধ্বনি দেখতে পাননি।

জয়পতাকা আতঙ্কিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "দাদু-উ।"

আশ্চর্যের বিষয় জয়ধ্বনি এই চিৎকার শুনতে পেলেন এবং চমকে উঠে বললেন, "ওই তো আমার নাতি!"

শ্যাম লাহিড়ীও শুনতে পেয়েছেন। তিনিও থমকালেন।

ব্যোমকেশ একগাল হেসে বললেন, "তা হলে তো সমস্যা মিটে গেল। কালই দু-দুটো মিটিং।"

জয়পতাকা ফের চেঁচাল, "দাদু? পিছনে বাঘ?"

জয়ধ্বনি ভারী অবাক হয়ে পিছনে তাকিয়ে একেবারে বাঘটার মুখোমুখি পড়ে গেলেন। বাঘ ও জয়ধ্বনি দুজনেই একটু অপ্রস্তুত। কিন্তু বাঘটার বোধহয় ডিনার জোটেনি। প্রথমটায় লজ্জায় মাথা নামিয়ে ফেললেও পরমুহূর্তেই সে গা-ঝাড়া দিয়ে লাফানোর জন্য গুড়ি মারল। শ্যাম লাহিড়ী পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে ওপর দিকে একটা গুলি ছুঁড়লেন। সেই শব্দে বাঘটা বিরক্ত হয়ে একবার জয়ধ্বনিকে একটু মুখ ভেঙচে সামান্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটে পালাল। এমনিতে বাঘ নরখাদক নয় বটে, কিন্তু আহত বা অক্ষম হলে তারা বাধ্য হয়ে সর্বভুক হয়।

বাঘ দেখে এবং পিস্তলের শব্দ শুনে ব্যোমকেশবাবু শ্যাম লাহিড়ীকে এমন চেপে ধরেছিলেন যে, আর ছাড়বার নামটি নেই।

শ্যাম লাহিড়ী বিরক্ত হয়ে বললেন, "করো কী হে ব্যোমকেশ। অমন চেপে ধরলে যে বাঘটাঘ এলে আর গুলিও চালাতে পারব না।"

ব্যোমকেশ লজ্জিত হয়ে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "না না, আপনার মতো বীর পুরুষ সঙ্গে থাকলে আর ভয় কী? তবে কিনা ইনফ্যাক্ট বাঘটা জয়ধ্বনিদাদাকে প্রায় সাবাড় করে ফেলেছিল। কী বলেন, আঁ?"

জয়ধ্বনি একটু খেঁচিয়ে উঠে বললেন, "তাতে তোমার ভালই হত। বাঘ আমাকেই চিবোতে থাকত, তোমরা বেঁচে যেতে।"

ব্যোমকেশ বিষন্ন হয়ে বললেন, "আমার মরারও জো নেই কিনা। কাল দু-দুটো মিটিং।"

"মিটিং-এর কথা যদি ফের উচ্চারণ করে তো এই লাঠি তোমার মাথায় পড়বে।"

"যে আজ্ঞে।" বলে ব্যোমকেশ চুপ করে গেলেন।

জয়ধ্বনি শ্যাম লাহিড়ীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিন্তু আমি যে আমার নাতির গলা শুনলুম! কী হল বলো তো?"

শ্যাম লাহিড়ী বললেন, "আমিও শুনেছি।"

ব্যোমকেশ বললেন, "আমিও।"

জয়পতাকা চেঁচিয়ে উঠে হাত নেড়ে বললেন, "এই যে আমি এখানে।"

জয়ধ্বনি চমকে উঠে বললেন, "ওই আবার! এই যে দাদুভাই, আমি যাচ্ছি তোমার কাছে। ভয় পেও না। চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকো।"

কিন্তু জয়পতাকা বুঝতে পারছিলেন, কাছে দেখালেও—তাঁর দাদু এবং তাঁর সঙ্গীরা এখনও অনকেটা দূরে। জলার ওধারে। কী করে যে অত দূরের কথা শোনা যাচ্ছে তা জয়পতাকা বুঝতে পারলেন না। তবে দেখলেন, তিন বুড়ো জলার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেছেন।

তিনজনেই জলার সামনে এসে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। জলে নামা এবং জলা পার হওয়া তাঁদের পক্ষে একটু শক্ত।

জয়পতাকা হঠাৎ লক্ষ করলেন, তাঁর দূরবীন থেকে হঠাৎ যেন সার্চ-লাইটের মতো একটা আলো ছুটে গিয়ে তিনজনের পায়ের কাছে পড়ল। দেখা গেল, জলার মধ্যে একটা সরু আলোকিত পথ ফুটে উঠেছে। আগুপিছু হয়ে অনায়াসে চলে আসা যায়।

তিনজনেই একটু স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। তারপর শ্যাম লাহিড়ী চাপা স্বরে বললেন, "জয়ধ্বনি, বলেছিলুম কিনা এই জঙ্গলে অনকে-কিছু হয়!"

জয়ধ্বনি বললেন, "দেখতেই পাচ্ছি ভায়া। কিন্তু না এগিয়েও তো উপায় নেই।"

ব্যোমকেশ কথাটার সায় দিলেন, "যথার্থ বলেছেন। ইনফ্যাক্ট জয়পতাকাকে পাওয়া না গেলে কালকের দু-দুটো মিটিং-ই বরবাদ হয়ে যাবে। ইনফ্যাক্ট আমি তো সংবর্ধনার বদলে শোকসভা করব বলে একরকম ঠিক করেই ফেলেছিলাম।"

জয়ধ্বনি লাঠিটা তুলে নামিয়ে নিয়ে বললেন, "না, তোমাকে এখন মারব না। আগে জয়পতাকার সঙ্গে দেখা হোক, তারপর তোমার ব্যবস্থা।"

ব্যোমকেশ সভয়ে জয়ধ্বনির কাছ থেকে সরে এলেন এবং সকলের আগেই আলোকিত পথটি ধরে হাঁটা দিলেন।

জলা পার হতে তাঁদের তিনজনের মোটেই সময় লাগল না। তারপর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হেঁটে তিজন খাদের ধারে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু খাদ তাঁদের পথ আটকাতে পারল না। আলোর রশ্মি গিয়ে সোজা পড়ল খাদের ওপরে, ওপার-এপার জুড়ে পড়ে থাকা একটা গাছের ওপরে। গাছটা কোত্থেকে এল কে জানে। তবে

তিন বুড়ো খাদটা ওই গাছের ওপর দিয়ে হেঁটে পার হওয়ার পরই গাছটা আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল এবং অন্যান্য গাছের সঙ্গে মিশে গেল। কাণ্ডটা দেখে জয়পতাকা হাঁ করে রইলেন।

চোরাবালির ওপরেও আলোটা গিয়ে পড়ে তিন বুড়োকে পথ দেখাল। তিনজনে দিব্যি হেঁটে চোরাবালি পেরিয়ে এলেন।

"দাদুভাই, তুমি কোথায়?"

"এই যে এখানে!" বলে জয়পতাকা আত্মবিস্মৃত হয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন।

উঠলেন বটে, কিন্তু নামলেন না। তাঁর বেয়াদব চটিজোড়া লাফ দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে একেবারে শূন্যে তুলে ছাদের কার্নিশ পার করে নিচের বাগানের মধ্যে নামিয়ে আনল। তবে নামাল খুব সাবধানে। ধরে।

জয়পতাকাকে দেখে জয়ধ্বনি এসে জড়িয়ে ধরে আনন্দে কেঁদে ফেললেন, "বেঁচে আছিস দাদুভাই? ভাল আছিস তো?"

"ইনফ্যাক্ট বাঘের পেটে যে যাওনি বাবা, সেটাই যথেষ্ট। গেলে খুব বিপদ ছিল। কাল তোমাকে নিয়েই দু-দুটো মিটিং। স্বয়ং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আসছেন সভাপতি হয়ে।"

শ্যাম লাহিড়ীর মুখখানা খুবই গম্ভীর। তিনি চারদিকটা টর্চ ফেলে দেখবার চেষ্টা করছিলেন, তার দরকার হল না। হঠাৎ একঝাঁক উজ্জ্বল আলোয় চারদিকটা ভারী স্পষ্ট হয়ে উঠল।

জয়ধ্বনি চোখের জল মুছে বললেন, "এটা কীরকম জায়গা দাদুভাই? জঙ্গলের মধ্যে কার এমন সুন্দর বাড়ি?"

শ্যাম লাহিড়ী একটা শ্বাস ফেলে বললেন, "এই সেই পটাশগড় হে জয়ধ্বনি। জায়গাটা ভাল নয়।"

"ভাল নয় মানে? দিব্যি জায়গা।"

"যা দেখছ এসব কিছুই সত্যি নয়। ভ্রান্তি মাত্র।"

"তোমার মাথা, চলো দাদুভাই, বাড়ির মালিকের সঙ্গে কেটু আলাপ করে আসি।"

জয়পতাকা ব্যাজার মুখ করে বলেন, "তার সঙ্গে আমার যে দেখাই হয়নি।"

"তা এত বড় বাড়ি দেখাশুনো করছে কে?"

"কেউ নয়।"

শ্যাম লাহিড়ী বললেন, "এখানে কেউ থাকে না জয়ধ্বনি। এটা একটা ধ্বংসস্তূপ। যা দেখছ সেটা শুধু দেখানো হচ্ছে।"

জয়ধ্বনি দার্শনিকের মতো বললেন, "ওরে বোকা, জলে যে চাঁদের ছায়া পড়ে সেটাও তো মিথ্যে, তবে ছায়াটা পড়ে কেন জানো? ওই আসল চাঁদটা আকাশে আছে বলেই।"

ব্যোমকেশককেও এই প্রসঙ্গে কিছু বলতে হয়, নইলে তিনি আলোচনা থেকে বাদ পড়ে যান। তাই বললেন, "ইন ফ্যাক্ট চাঁদটা আমাদের খুবই উপকারে লাগে। জ্যোৎস্না রাতে আমরা শহরের রাস্তার আলোগুলো নিবিয়ে দিয়ে অনকে কারেন্ট বাঁচাই।"

জয়ধ্বনি কটমট করে ব্যোমকেশের দিকে চেয়ে বললেন, "যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলবে না বলে দিচ্ছি।"

ব্যোমকেশ জয়ধ্বনির লাঠিটার দিকে সভয়ে চেয়ে দু'পা পিছিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর জয়পতাকার দিকে চেয়ে গদগদ স্বরে বললেন, "তুমি আমাদের গৌরব যে কী পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছ, তা বলে শেষ করা যায় না। সামনের বছর ভজুরাম মেমোরিয়াল স্কুলে হুড়হুড় করে ছেলেরা ভর্তি হবে। কাল তোমাকে আমরা বিরাট করে নাগরিক সংবর্ধনা দিচ্ছি। বাঘা যতীনের পর বাঙালি আর এরকম বীরত্ব দেখাতে পারেনি। ইন ফ্যাক্ট তোমাকে আমরা বৃষবিলাসী উপাধিও দেব। 'বৃষবিলাসী জয়পতাকা'—চমৎকার হবে। কী বলল অ্যাঁ? তবে কাজটা যে তুমি খুব ভাল করেছো এমনও বলা যায় না। শত হলেও কালু হচ্ছে শিবের বাহন। তার পিঠে চাপাটা তোমার পক্ষে একটু বাড়াবাড়িই হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে এ-ব্যাপারে তোমাকে সতর্ক হতে হবে। ঘোড়ার পিঠে চাপো, মোষের পিঠে চাপো, গাধার পিঠে চড়তেও বাধা নেই। কিন্তু ষাঁড় নেভার। অনকে ধর্মপ্রাণ নরনারী ভয়ঙ্কর চটে গেছে। আমি হচ্ছি পুরপিতা, সোজা কথায় শহরের বাবা, সকলেরই বাবা। আমাকে সকলের প্রতিই পক্ষপাতশূন্য হয়ে নজর রাখতে হয়..."

জয়ধ্বনি তেড়ে এসে লাঠি উঁচিয়ে বললেন, "থামবে কি না?"

"যে আজ্ঞে। তবে সত্যি কথা বলতে আমি কখনও ভয় খাই না।"

"নিকুচি করেছে তোমার সত্যি কথার।"

দু'জনের মধ্যে দিব্যি একটা তর্কাতর্কি বেধে গেল।

শ্যাম লাহিড়ী জয়পতাকাকে একটু দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন, "ব্যাপারটা কী বলল তো? এ-বাড়িতে কারা আছে?

"কেউ নেই।"

"তবে আলোটালো জ্বলছে কী করে?"

"অনকে ভেবেও কিছু বুঝতে পারছি না। ভিতরে এমন বন্দোবস্ত যে, মনে হয় মানুষের বসবাস আছে। কিন্তু কেউ নেই। অথচ..."

"অথচ কী?"

"সবকিছু আপনা থেকেই হয়ে যাচ্ছে।"

"তুমি ভয় পাওনি?"

"ভয়ও পেয়েছি। আবার ভয়টা একসময়ে কেটে গেছে। আমার মনে হচ্ছে, কিছু একটা দেখানোর জন্যই যেন আমাকে এখানে টেনে আনা হয়েছে।"

শ্যাম লাহিড়ী চোরাবালির পরিখার দিকে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে থেকে বললেন, "ফিরে যাওয়ার পথ জানো?"

জয়পতাকা মাথা নেড়ে বললেন, "না, একটা শেয়াল আমাকে পথ দেখিয়ে এনেছিল।"

"আমরা এলাম একটা আলোকে অনুসরণ করে।"

"হ্যাঁ। ছাদ থেকে দূরবীন দিয়ে আমি সবই দেখেছি।"

শ্যাম লাহিড়ী গম্ভীর গলায় বললেন, "এই জায়গা সম্পর্কে আমার ধারণা ভাল নয়। তুমি যে এখানে এসেও নিরাপদে আছ দেখে নিশ্চিন্ত হচ্ছি আবার অন্য দিকে দুশ্চিন্তাও হচ্ছে। আজ অবধি পটাশগড় থেকে কেউ ফেরেনি।"

“বলেন কী?”

“আমি বেশ কয়কেজনকে জানি।”

ঠিক এই সময়ে হাহা করে সেই দুষ্টু বাতাসটা বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে বয়ে এল, “কেউ ফিরবে না। কেউ ফেরবে না।”

শ্যাম লাহিড়ী স্তব্ধ হয়ে গেলেন, জয়ধ্বনি আর ব্যোমকেশের ঝগড়াও থেমে গেল। সবাই চারিদিকে তাকাতে লাগলেন।

আবার বাতাস বইল, বলল, “ফিরবার পথ নেই, ফিরবার পথ নেই।”

ভুতুর মরণ-দৌড় সফল হতে-হতেও হল না। মাত্র হাত-দশকে চোরাবালি পার হতে বাকি ছিল। ভুতু গড়াতে-গড়াতে যখন পৌঁছে যাওয়ার মুখে তখন বালির গ্রাস তার কোমর অবধি গিলে ফেলল। কিন্তু শরীরে তার বেজায় ক্ষমতা। তাই ডুবতে-ডুবতেও সে শরীরটাকে ওলট-পালট খাওয়াতে লাগল। সেই সাঙ্ঘাতিক ছটফটানি ডাঙায় সাঁতার দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টার মতো। কিন্তু ভুতু তাতে আরও দু-চার হাত এগিয়ে যেতে পারল। একটা লতার মতো জিনিস বালিতে মুখ ডুবিয়ে আছে একটু তফাতে। ভুতু প্রাণপণে নিজেকে সেদিকে ঠেলে দিতে লাগল। শরীর এবং মন একসঙ্গে একযোগে একরোখা হয়ে উঠলে তাকে ঠেকোনা শক্ত। দুর্জয় চেষ্টায় বালিতে ঝড় তুলে ভুতু উপুড় হয়ে হাত বাড়িয়ে কোনওক্রমে লতাটা ধরে ফেলল। বেশ শক্ত আর মোটা একটা লতানে গাছ। সেটা প্রাণপণে চেপে ধরে নিজেকে বালির ওপর দিয়ে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে সে ডাঙায় উঠল।

যে জায়গায় ভুতু ডাঙায় উঠল সেটা বন্য গাছপালায় ছাওয়া এবং জমি খুব উঁচু-নিচু। এখান থেকে বাড়িটা দেখা যায় না। সামনেই একটা টিলার মতো কিছু রয়েছে।

ভুতু বসে-বসে কিছুক্ষণ হাঁফ ছেড়ে নিল। তারপর উঠে দাঁড়াল।

সে জানে আগকোর দিনে শত্রুর আক্রমণের ভয়ে দুর্গের চারদিকে পরিখা থাকত, থাকত ড্র ব্রিজ। এখানে পরিখার বদলে আছে চোরাবালি। এবং ড্র ব্রিজ বলতে কিছুই নেই। কিন্তু পরিবর্তনশীল একটা পথ আছে। সেই পথ কার ইচ্ছায় চলে তা বোঝবার উপায় নেই। ভুতু এও বুঝতে পারল, এখান থেকে বেরোবার কোনও উপায় নেই। পরিবর্তনশীল পথটি খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব।

ভুতু মাথা ঠাণ্ডা রেখে জায়গাটা ভাল করে দেখল। সামনে টিলার ওপর একটা মস্ত বটগাছ ঝুরি নামিয়ে জায়গাটা অন্ধকার করে দাঁড়িয়ে আছে। এদিক সেদিক মেলা ঝোপঝাড়।

ভুতু চট করে ওপরে উঠল না। সে একটু আড়ালেই থাকতে চায়। আগে বোঝা দরকার, এখানে কারবারটা কী।

স্কাউট-ছুরিটা বুদ্ধি করে পকেটে রেখেছিল ভুতু। সেটা হাতে নিয়ে সে চারদিক ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগল। ঝোপঝাড়ের ফাঁকে-ফাঁকে মেলা পাথরের চাঁই পড়ে আছে। এরকম জায়গায় পাথরের চাঁই থাকতেই পারে। কিন্তু কয়কেটা পাথরের চাঁই অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল। যেন ভিতর থেকে আলো বেরোচ্ছে। সে উজ্জ্বল পাথরগুলোকে স্পর্শ করল না। বরং একটু দূর থেকে লক্ষ করল।

অনকেক্ষণ লক্ষ করার পর ভুতুর মনে হল, পাথরগুলো একটা জ্যামিতিক নকশায় সাজানো। যদি সরলরেখা দিয়ে যুক্ত করা যায় তা হলে একটা ষড়বাহু-ক্ষেত্র তৈরি হবে। ভুতু এও লক্ষ করল, পাথরগুলোর রং একরকম নয়। লাল নীল সবুজ হলুদ বেগুনি আর কমলা। কিন্তু রং খুব ফিকে। ভাল করে লক্ষ না করলে বোঝা কঠিন।

ভুতু অঙ্ক বা জ্যামতিতে খুবই কাঁচা। কিন্তু সেটা তার বুদ্ধির দোষ নয়, সে পড়াশুনো করতে ভালবাসে না, তাই সবাই তাকে কাঁচা বলে জানে। কিন্তু আজ তার মনে হল, ওই উজ্জ্বল পাথরগুলোর জ্যামিতিক নকশায় একটা কোনও সঙ্কেত আছে। প্রত্যকেটা পাথর পরস্পরের চেয়ে সমান দূরত্ব রয়েছে। ভুতুর আন্দাজ এই দূরত্বে চার ফুটের মতো হবে।

ভুতু খানিকক্ষণ ভাবল। তারপর 'যা হওয়ার হবে' ভেবে নিয়ে সে গিয়ে ওই ষড়ভুজের ভিতরে ঢুকে একেবারে মধ্যবিন্দুতে দাঁড়াল।

কিছুই ঘটল না।

ভুতু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারদিক ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। কোনও পরিবর্তন নেই। কিছুই ঘটল না।।

ভুতু সাহস করে পাথরগুলোকে নাড়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু এক চুলও নড়াতে পারল না।

সে আবার একটু দূরে গিয়ে ষড়ভুজটাকে ভাল করে লক্ষ করল। ছ'টা ছ'রঙের পাথর জ্বলজ্বল করছে। কী মানে এর? কে এদের এভাবে মাটিতে সাজিয়ে রাখল? এর মধ্যে কি কোনও রহস্যের ইঙ্গিত রয়েছে?

ভুতু হতাশ হল না। কিন্তু ভাবতে লাগল।

পৃথিবীতে যা-কিছু আছে এবং যা-কিছু হয়, সবই যুক্তিপূর্ণভাবে। কোনও কিছুই অযৌক্তিক নয়। এমনকী ভূতও যদি থেকে থাকে তবে তার পিছনেও কোনও না কোনও যুক্তি এবং বিজ্ঞানও থাকবেই। ভুতু এটা বরাবর দেখেছে। সুতরাং এই ছ'টা পাথরের পিছনেও যুক্তি আছে। কিন্তু কী সে যুক্তি?

ভুতু কাছেপিঠে পড়ে-থাকা পাথরগুলোর ভিতর থেকে একটা পাথর তুলে নিল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর পাথরটা তুলে নীল রঙের পাথরটার ওপর খুব জোরে ছুঁড়ে মারল সে। সঙ্গে-সঙ্গে চড়াক করে একটা মৃদু বজ্রাঘাতের শব্দ আর খানিকটা নীলচে আলো ঠিকরে উঠল পাথরটার থেকে। আর কিছু হল না। সে আবার লাল পাথরটার গায়ে একইরকমভাবে পাথর ছুঁড়ল। একইরকম শব্দ হল তবে এবার ঠিকরে বেরোল লাল আগুনের হল্কা। একে-একে পঞ্চম পাথরটার গায়েও পাথর ছুঁড়ল সে। বাকি শুধু হলুদটা। শেষবার পাথর তুলে প্রাণপণে ছুঁড়ে মারল সে। সেই শব্দ আর সেই আগুন।

তারপরেই সে হঠাৎ দেখতে পেল, ছ'টা পাথর থেকেই ছ'রকমের আলোর রেখা বেরিয়ে পরস্পরের সঙ্গে ছ'টা বাহুর মতো লেগে গেছে। একটা অদ্ভুত সুন্দর নিখুঁত আলোর ষড়ভুজ। ভুতু মুগ্ধ হয়ে দেখল। ধীরে-ধীরে কাছে এগিয়ে গেল। তারপর দেখল, ষড়ভুজের মাঝখানে একটা রন্ধ্র। ভেতরে আলো জ্বলছে। একটা সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে।

ভুতু সময় নষ্ট না করে সিঁড়ি দিয়ে নামল। বেশি দূর নয়। মাত্র কয়েক হাত। সিঁড়ির সঙ্গেই একটা মাঝারি মাপের ঘর। চারটে মসৃণ দেওয়াল। কোনও আসবাব নেই। সিঁড়ির ঠিক বিপরীত দিকের দেওয়ালে ফুট-চারেক উচ্চতায় একটা কালো বৃত্ত। অনেকটা ফুটবলের মতো বড়। ভুতু সেটার কাছে এগিয়ে গেল। কাছাকাছি যেতেই সে হঠাৎ একটা চুম্বকের মতো আকর্ষণ টের পেল। কিছু যেন তাকে টানছে। প্রচণ্ড টানছে। ভুতু সামলাতে পারল না, যেন একটা স্যাকশন যন্ত্র দিয়ে টেনে ধরে রেখেছে তাকে। দেওয়ালের খুব কাছাকাছি গিয়ে সে থামতে পারল। সে বোধ করল, একটা অদৃশ্য বলয়ের মধ্যে সে দাঁড়িয়ে আছে।

কারও কোনও কথা শুনতে পেল না ভুতু। কিন্তু তার মাথার মধ্যে যেন কেউ একটা সঙ্কেতবার্তা পাঠাল, "তোমার যে কোনও ইচ্ছে প্রকাশ করো, পূর্ণ হবে।"

ভুতু জবাবে বলল, "আপনি কে কথা বলছেন?"

"আমি কেউ নই।"

"আপনি কি ভূত?"

"না। আমি ইচ্ছা।"

"কার ইচ্ছা?"

'আমার নিজেরই।"

"তার মানে? আমাকে বুঝিয়ে দিন।"

"কিছু বুঝতে পারবে না।"

"তা হলে ইচ্ছে প্রকাশ করতে বলছেন কেন?"

"আমার যে তাই কাজ।"

"ওই ছ'টা পাথর কিসের?"

"একটা হেক্সাগন।"

"ওটা দিয়ে কী হয়?"

"ওটা একটা কম্বিনেশন। একটা দণ্ড আছে, তা দিয়ে ছ'টা পাথরকে পর্যায়ক্রমে স্পর্শ করলেই দরজা খুলে যায়। তুমি অবশ্য পাথর ছুঁড়ছ।"

"তাতে কি ক্ষতি হয়েছে?"

"না। পাথরগুলো ভাঙা যায় না। অ্যাটমবোমা দিয়েও না।"

"জয়পতাকাবাবু কোথায়?"

"কেল্লায়।"

"উনি কি নিরাপদ?"

"এখন পর্যন্ত।"

"তারপর কী হবে?"

"কেউ বাঁচবে না।"

"কেন?"

"এখানে কেউ এসে বাঁচে না।"

“আমি?”

“তুমি? তোমার কথা আলাদা।”

“কেন?”

“তুমি যে কম্বিনেশনটা বের করেছ।”

“জয়পতাকাবাবু বাঁচবেন না?”

“না।”

“কিন্তু আমি যে ওঁকে উদ্ধার করতে এসেছি।”

“উনি সাহেবের কেল্লায় ঢুকেছেন। ডিনার খেয়েছেন। ওঁকে উদ্ধার করা অসম্ভব।”

“এই যে বললেন আমার সব ইচ্ছা পূর্ণ হবে!”

“হবে।”

“জয়পতাকাবাবুকে উদ্ধার করাই যে আমার ইচ্ছা।”

“ওসব নয়। তোমার নিজের সম্পর্কে ইচ্ছা কী? সেটা পূর্ণ হবে।”

“সাহেব কে?”

“আমাদের প্রভু।”

“তিনি কোথায় থাকেন?”

“তিনি নেই।”

“তার মানে?”

“তিনি বহুকাল আগে মারা গেছেন।”

“তা হলে আপনি কে?”

“আমি কেউ নই। শুধু তাঁর পুঞ্জীভূত ইচ্ছা।”

“আমি বুঝতে পারছি না। বুঝিয়ে দিন।”

“বুঝতে পারবে না। তোমার মস্তিষ্ক তত উন্নত নয়।”

“আমার মস্তিষ্কের উন্নতি কী করে হবে?”

“হবে।”

“কী করে?”

“অপেক্ষা করো।”

ভুতু পরিষ্কার টের পেল, দুটো হাত দেওয়াল থেকে বেরিয়ে এল তার মাথার দু’দিক দিয়ে। তারপর বাক্সের ডালা খোলার মতো তার মাথার খুলি খুলে ফেলল। সে বিন্দুমাত্র ব্যথা টের পেল না। কয়েক সেকেণ্ড শুধু মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ-চমকের মতো কিছু ঘটতে লাগল। তারপর হাত দুটো আবার দেওয়ালে ঢুকে মিলিয়ে গেল।

“এটা কী করলেন?”

“ছোট একটা অপারেশন।”

“কই আমার মস্তিষ্কের তত উন্নতি ঘটল না?”

"ঘটেছে। অপেক্ষা করো, টের পাবে।"

"কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।"

"বেশিক্ষণ নয়। তোমার ধূসর কোষ জাগ্রত হয়েছে। সমন্বয়ের অপেক্ষা। তাড়াতাড়ি করলে তুমি মারা পড়বে। তাড়াতাড়ি এসব জিনিস হয় না।"

"কেন হয় না?"

"মস্তিষ্কের ক্রিয়া হঠাৎ বেড়ে গেলে তুমি তাল সামলাতে পারবে।" না।"

"ডিনার ব্যাপারটা কী বলবেন? আমি বাতাসে বারবার ডিনারের কথা শুনেছি।"

"ডিনার হল খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সাহেব কখনও একা ডিনার খেতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর সঙ্গী ছিল না। খুব কষ্ট হত ডিনারের সময়।"

"তারপর?"

"তারপর আমরা ডিনারের সময় লোক হাজির করতাম। কিন্তু তারা এত নিবোধ যে সাহেবের সঙ্গে সমান পর্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলার যোগ্য ছিল না। সাহেবের ডিনার মাটি হত।"

"তারপর? সেই লোকগুলোর কী হত?"

"এক রাত্রি তারা খুব আদর-যত্ন পেত। কিন্তু পরদিন সকালে উঠেই তারা দেখতে পেত, কেল্লার জায়গায় একটা ধ্বংসস্তূপ। চারদিকে চোরাবালি। তারা বেশিরভাগই পালাতে চেষ্টা করে চোরাবালিতে ডুবে মারা গেছে।"

"কেল্লাকে তারা ধ্বংসস্তূপ দেখত কেন?"

"ফ্রিকোয়েন্সি পালটে দেওয়া হত বলে।"

"বুঝিয়ে বলুন।"

"ফ্রিকোয়েন্সি কাকে বলে জানো?"

"কম্পন।"

"সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কম্পন। পৃথিবীর সব বস্তুরই কম্পন আছে। একটা জিনিসের ওই কম্পন বদলে দিলে সেটা অন্যরকম বা অদৃশ্যও হয়ে যেতে পারে। এসব উন্নত বিজ্ঞানের কথা।"

"কিন্তু আমি বুঝতে পারছি।"

"তোমার মস্তিষ্কের উন্নতি ঘটেছে। কী বুঝতে পারছ?"

"একটা জিনিস দৃশ্য বা অদৃশ্য হতে পারে কিন্তু তার অস্তিত্ব মুছে যায় না। তবে তার কম্পন আমাদের কম্পনের সমানুপাতিক হলে আমরা সেটাকে বোধ করতে পারি না।"

"অনেকটা বুঝেছ। কিন্তু কী করে তা ঘটানো হয় তা জানো না।"

"একটু একটু আন্দাজ করছি।"

"কী আন্দাজ?"

"সাহেব কিছু প্রাণহীন বস্তুর মধ্যে নিজের বোধ বুদ্ধি ও ইচ্ছা সঞ্চার করতে পেরেছিলেন।"

"বিশ্বজগতে প্রাণহীন কিছু নেই। সবই প্রাণময়। তবে তোমাদের বিজ্ঞান দিয়ে তা বুঝে ওঠা অসম্ভব।"

"সব বস্তুর মধ্যেই কি প্রাণ আছে?"

"আছে।"

"কিন্তু বুদ্ধি বা কর্মকুশলতা তো নেই।"

"না।"

"সাহেব সেইসব বস্তুর মধ্যে সেটা সঞ্চার করেছিলেন, তাই তো!"

"তাই। আমরা আজ্ঞাবাহী ছিলাম।"

"আপনাদের স্বাধীন ইচ্ছা কি আছে?"

"প্রোগ্রাম আছে।"
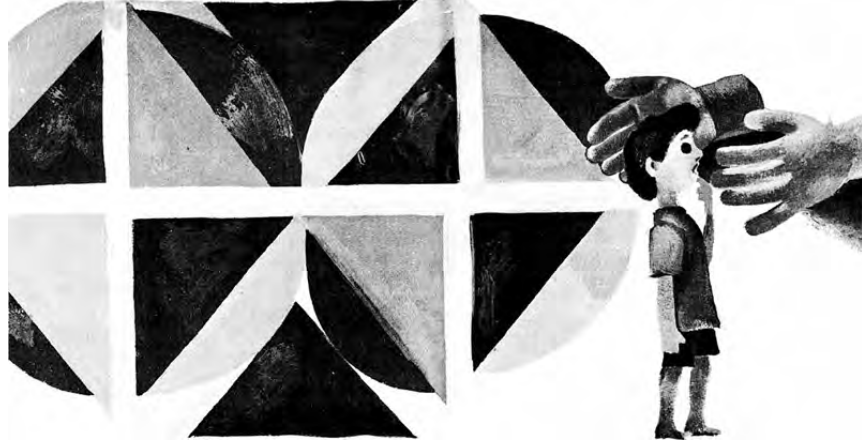
"বুঝতে পারছি। অনেকটা কম্পিউটারের মতো, কিন্তু আরও অনেক উন্নত।"

"অনেক। তুমি বুদ্ধিমান।"

"আমার লাঠিটা কে কেড়ে নিয়েছিল?"

"ইচ্ছা।"

"আমার পথ কে মুছে দিয়েছিল?" "ইচ্ছা।"

"বালিতে কার পায়ের দাগ পড়েছিল"

"তুমি খুব সাহসী।"

"আবার জিজ্ঞেস করছি, বালিতে কার পায়ের দাগ পড়েছিল?"

"তুমি খুব সাহসী ও বুদ্ধিমান। তোমার জিদও প্রচণ্ড।"

"কিন্তু এ-প্রশ্নটার জবাব দিচ্ছেন না কেন? বালিতে কার পায়ের ছাপ পড়েছিল?"

কিছুক্ষণ নীরবতা।

"বলব না।"

"তা হলে বলব, আপনি জানেন না।"

কণ্ঠস্বরটা হঠাৎ যেন ভয় খেয়ে একটু কেঁপে গেল, "অন্য প্রশ্ন করো।"

"আমি এই প্রশ্নেরই জবাব চাই।"

“আমি এই প্রশ্নের জবাব দেব না।আমি তোমার আজ্ঞাবাহী নই।”

“আপনি কি রাগ করেছেন?”

“আমাদের রাগ নেই। রাগ অযৌক্তিক ব্যাপার।”

“আমার মনে হয়, বালিতে যার পায়ের ছাপ পড়েছিল আপনি তাকে ভয় পান।”

“অন্য প্রশ্ন করো।”

আপনার সাহেবের নাম কী?

“আলফাবেট।”

“এটা কী ধরনের নাম?”

“সাহেব তোমাদের মতো মানুষ ছিলেন না।”

“তিনি কীরকম মানুষ ছিলেন?”

“অনেক উন্নত।”

“তিনি কি অন্য কোনও গ্রহের মানুষ?”

“তিনি একটা অঘটন।”

ভুতু বুঝল, এ প্রশ্নেরও জবাব পাওয়া যাবে না। সে তাই অন্য প্রশ্ন করল।

“তিনি কতদিন আগে মারা গেছেন?” “চার বছর।”

“সাহেবের শরীরটার কী হল?”

“অন্য প্রশ্ন করো।”

“এই দুর্গটা কতদিনের?”

“দু’শো বছর।”

“সাহেব কি দু’শো বছর আগে এখানে ছিলেন?”

“না, এটা পটাশগড়ের এক রাজা বানিয়েছিল। দুর্গ কালক্রমে ধ্বংস হয়ে যায়। সাহেব দুর্গা দখল করে ছিলেন।”

“বুঝলাম। দুর্গে কি আমি একবার যেতে পারি?”

“তুমি ইচ্ছা করলে সবই পারো। কিন্তু দুর্গে কাউকেই পাবে না।”

“কেন? জয়পতাকাবাবু কি দুর্গে নেই?”

“আছে, একা নয়, সঙ্গে আরও তিনজন লোক আছে। কিন্তু তুমি ওদের দেখতে পাবে না।”

“কেন পাব না।”

“ওদের ফ্রিকোয়েন্সি আলাদা হয়ে গেছে। তোমার সঙ্গে মুখখামুখি হলেও তুমি ওদের দেখতে পাবে না। তোমরা পরস্পরকে ভেদ করে যাবে, কিন্তু কেউ কারও অস্তিত্ব টের পাবে না।”

“কী সর্বনাশ? এর কোনও উপায় নেই?”

“না। ওরা চিরকাল এখানেই থেকে যাবে। যদি বেরোতে চায় তা হলে চোরাবালিতে ডুবে মরবে।”

“আর আমি?”

“তোমার কথা আলাদা। তুমি ইচ্ছা করলেই ফিরে যেতে পারো। বিপদ হবে না।”

“জয়পতাকাবাবুর সঙ্গে আর কে কে আছে?”

“জয়ধ্বনি, শ্যাম লাহিড়ী আর ব্যোমকেশ।”

“সর্বনাশ! এরা যে সবাই আমার ভীষণ চেনা।”

“দুঃখিত, ওদের জন্য কিছুই করার নেই।”

“ষড়ভুজটার অর্থ কী?”

“ষষ্ঠ ইকোয়েশন। মানুষ বুঝতেই পারবে না।”

“ইকোয়েশন আমি জানি।”

“এটা কঠিন। কেউ জানে না। সাহেব জানতেন।”

“এতে কী হয়?”

“ওই ইকোয়েশনেই বিশ্ব রহস্যের, চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে, যে কষতে পারে সে দারুণ সব কাজ করতে পারে।”

“আমি কি ইকোয়েশন মিলিয়েছি?”

“না। তুমি শুধু কম্বিনেশনটা করতে পেরেছ। ওটা সোজা, তবু সবাই পারে না।”

“আমাকে কতক্ষণ আটকে রাখবেন?”

“তুমি চাইলেই ছেড়ে দেব।” “আমি আর-একটা কথা জানতে চাই। পটাশগড়কে সকলে দেখতে পায় না কেন?”

“আমরা মাঝে-মাঝে পুরো জায়গাটারই স্পন্দন বদলে দিই। তখন দুর্গ অদৃশ্য হয়ে যায়, চোরাবালিও অদৃশ্য হয়ে যায়।”

“জঙ্গলের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গা আছে, সেখানে জঙ্গলের পশুরা কেউ ঢুকতে পারেনি, আমিও না। ওই জায়গাটায় কী ছিল?”

“টাইম বেরিয়ার বললে বুঝবে?”

“না।”

“ওই জায়গাটা তোমার সময়ে নেই। ভিন্ন সময়ে প্রোগ্রাম করা আছে।”

“তার মানে?”

“তুমি যখন জায়গাটা দেখছ, তখন ওটা বর্তমানকালে নেই। পাঁচ বছর অতীতে পিছিয়ে রয়েছে। ওর চারদিকে সময়ের বেড়া থাকায় ঢুকতে পারোনি, ঢুকতে পারলে তোমার বয়স এক মুহূর্তে পাঁচ বছর পিছিয়ে যেত।”

“ঢোকা যায় না?”

“না। লক করা আছে। টাইম বেরিয়ার আছে।”

“আমি যদি যেতে চাই।”

“কেন চাও?”

“আমি পাঁচ বছর আগে কেমন ছিলাম তা জানতে চাই।”

“সত্যিই চাও?”

“হ্যাঁ।”

“তুমি বুদ্ধিমান।”

দেওয়াল থেকে একটা হাত বেরিয়ে এল। তাতে একটা ছোট স্ফটিকের দণ্ড।

“এটা নাও। টাইম বেরিয়ারে স্পর্শ করলেই ঢুকতে পারবে।”

ভুতু দণ্ডটা নিল। তারপর বলল, “এবার কী করব?”

“ইচ্ছা করো। ইচ্ছা করলেই ওই জায়গায় চলে যেতে পারবে।”

হঠাৎ সাকশনটা বন্ধ হয়ে গেল। ভুতু টের পেল, চারদিকের বলয়টা আর নেই। সে স্ফটিকের দণ্ডটা হাতে নিয়ে চোখ বুজে প্রাণপণ ইচ্ছা করল, “আমি ওখানে যাব।”

না, কোনও ম্যাজিক ঘটল না। তবে ভুতুর সমস্ত শরীরে যেন একটা বিদ্যুতের বেগ শিহরিত হয়ে বয়ে গেল। সে চলতে লাগল। সিঁড়ি বেয়ে উঠে সে সোজা চোরাবালিতে নেমে ছুটতে লাগল। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে তীরগতিতে সে হাজির হয়ে গেল সেই ফাঁকা ভূমিখণ্ডের সামনে।

স্ফটিকের দণ্ডটা সামনে বাড়াতেই একটা দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ হল। কিছু সরে গেল সামনে থেকে।

ঢুকবার আগে ভুতু ক্ষণেক দ্বিধা করল। তার বয়স পাঁচ বছর কমে যাবে? কী করে হবে সেটা? কেমন লাগবে?

খুব সাবধানে পা বাড়াল ভুতু। খুব ধীর পদক্ষেপে পা রাখল মাটিতে। তারপরেই চমকে থেমে গেল। শরীরের ওপর থেকে কিছু খসে পড়ে গেল যে। যেন একটা খোলস। মাথাটা সামান্য ধাঁধিয়ে গেল।

সামলে উঠে ভুতু দেখল, তার শরীরের দৈর্ঘ্য অনেক কমে গেছে। একটু রোগা হয়ে গেছে সে। পাঁচ বছর আগে সে কি এরকম ছিল?

ভুতু দাঁড়িয়ে চারদিকটা দেখতে লাগল। কিছু নেই। কিন্তু সে জানে, পাঁচ বছর আগে আলফাবেট-সাহেব বেঁচে ছিল। আর এই জায়গাটা নিশ্চয়ই কোনও কারণে সময়ের বাঁধ দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। খুব সম্ভব আলফাবেট-সাহেবের দেখা এখানেই পাওয়া যাবে।

ভুতু চুপ করে একটা ঝোপের ধারে বসে রইল। লুকিয়ে থাকাই ভাল।

খুব বেশিক্ষণ বসতে হল না ভুতুকে। আচমকা একটা নীল আলো ঝলসে উঠল আকাশে। একটা তীব্র শিসের শব্দ তার কানের পরদা প্রায় ফাটিয়ে দিতে লাগল। চারদিকে মাটি গুড়গুড় করে কাঁপছে। ভুতু বাতাসে একটা তীব্র কম্পন টের পাচ্ছিল। সে সহ্য করতে পারল না। চোখ বুজে দাঁতে দাঁত চেপে হাত মুঠো করে মূর্ছিতের মতো ঢলে পড়ে গেল মাটিতে।

যখন চোখ মেলল, তখন সামনে একজন বিশাল চেহারার মানুষ দাঁড়িয়ে। প্রায় আট ফুট লম্বা, বিশাল দৈত্যের মতো আকৃতি। মানুষটা তাকে দেখছে।

ভুতু ভয়ে সিঁটিয়ে গেল।

লোকটা কথা বলল না, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় একটা বায়ু-তরঙ্গে লোকটা তার মগজে একটা প্রশ্ন পাঠিয়ে দিল, “কী চাও?”

ভুতু সভয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “আমার এক মাস্টারমশাই...”

আবার বায়ু-তরঙ্গ এল। লোকটা যেন বলে পাঠাল, "তোমাকে কিছুই বলতে হবে না। তোমার মগজের সব কথা এবং চিন্তাই আমি ধরতে পারছি।"

"আমি এখন কী করব?"

বায়ু-তরঙ্গ তার মগজে একটা ওলট-পালট ঘটিয়ে বলল, "সমাধান তোমার হাতেই আছে। বুদ্ধি খাটালেই পারবে। তোমার মগজ অনেক বেশি ক্রিয়াশীল। তুমি ষড়ভুজের কম্বিনেশন বের করেছ। পারবে। চেষ্টা করো।"

"ওদের বাঁচাননা যাবে?"

"চেষ্টা করো। হয়তো পারবে।"

"আপনি কী কৌশলে কথা বলছেন। এটাই কি টেলিপ্যাথি?"

"হ্যাঁ , তবে অনেক উন্নত ধরনের।"

"আপনি কোন্ গ্রহের মানুষ?"

"অনেক দূরের।"

"বালিতে কার পায়ের দাগ পড়েছিল?"

"নিউমারেলস-এর।"

"সে কে?"

"সে একটা অঙ্ক।"

"অঙ্ক। অঙ্ক কি কখনও হাঁটে। তাও জুতো পায়ে দিয়ে?"

"না, তবে অঙ্ককে শরীরী রূপ দিলে হয়।"

"তাকে কোথায় পাব?"

"কোথাও আছে। অঙ্কটা কষলেই পাবে। যেখান থেকে এসেছ, সেখানে ফিরে যাও। অঙ্ক প্রস্তুত আছে।"

আবার নীল আলোর ঝলকানি আর তীব্র শিসের শব্দ। ভুতু ফের চোখ বুজে ফেলল। যখন চোখ খুলল তখন কেউ নেই। তার মাথা ঘুরছিল। তবু সে টাইম বেরিয়ার ভেদ করে বেরিয়ে এল। তারপর ছুটতে লাগল।

যখন সেই ঘরটায় আবার ফিরে এল, তখন অবাক হয়ে দেখল, ঘরে একটা টেবিল আর চেয়ার পাতা, টেবিলের ওপর একটা প্যাড আর পেনসিল। প্যাডে দারুণ ইকোয়েশন।

ভুতু বসে পড়ল। অঙ্কটা তাকে করতেই হবে।

ওদিকে পটাশগড়ের কেল্লায় ডাইনিং হল-এ জয়পতাকা নিয়ে এসেছেন তিনজনকে। দেদার খাবার সাজানো।

জয়পতাকা বললেন, "যত খুশি খাও দাদু, এমন খাবার জীবনে খাওনি।"

জয়ধ্বনি একটু চটে উঠে বললেন, "তোর ঠাকুমার রান্নার চেয়েও ভাল? অত সোজা নয় রে। খাঁটি বিক্রমপুরের রান্না, ওর কাছে কেউ লাগে না। কচুর শাক বলো কচুর শাক, মুড়িঘণ্ট বলো মুড়িঘণ্ট, চাপড়ঘন্ট বলল চাপড়ঘন্ট, পিঠে-পায়েস-ওসব স্বর্গীয় জিনিস।"

"খেয়েই দ্যাখো না।"

সকলেরই খিদে পেয়েছে। রাত তো কম হয়নি।

খেতে বসেই প্রথম পদটা মুখে দিয়েই জয়ধ্বনি বলে উঠলেন, "এ-হচ্ছে মাংসের সুরুয়া, বেশ বেঁধেছে।"

পরের পদটা খেতে গিয়ে ব্যোমকেশ বললেন, "এ কুমড়োর ছক্কা না হয়ে যায় না। তবে খাসা হয়েছে।

শ্যাম লাহিড়ীই শুধু বিনা মন্তব্যে খেতে লাগলেন।

মাঝপথে একটা পদ আমিষ না নিরামিষ তাই নিয়ে ব্যোমকেশ আর জয়ধ্বনিতে একটু তর্ক বেধে উঠল। জয়ধ্বনি একটা কাঁটা-চামচ বিপজ্জনকভাবে উদ্যত করে ধরায় ব্যোমকেশ মিইয়ে গেলেন।

খেয়েদেয়ে উঠে ব্যোমকেশ বললেন, "আর দেরি নয়। এবার ফেরা যাক। ওদিকে দু-দুটো মিটিং-এর মেলা কাজ বাকি। আমার এখনও বক্তৃতা মুখস্থ হয়নি।"

সকলেই সায় দিলেন।

শুধু শ্যাম লাহিড়ী বললেন, "ফেরা খুব সহজ হবে না।"

জয়পতাকা বললেন, "শক্তও কিছু নয়। আমি তো দিব্যি একটা শেয়ালের পিছু পিছু চলে এলাম। আপনারা এলেন একটা আলো ফলো করে। আমি বরং ছাদে গিয়ে দূরবীনটা নামিয়ে আনি। ওটাই হচ্ছে আলোর সোর্স। তা ছাড়া আমার চটিজোড়াও হেলপ করবে।"

জয়পতাকা ছাদে উঠলেন বটে, কিন্তু দূরবীনটা খুঁজে পেলেন না। চটিজোড়াও আগের চেয়ে ভারী লাগছিল।

নিচে এসে জয়পতাকা বললেন, "দূরবীনটা নেই। এখানে খুবই অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে দেখছি। একেবারেই অবিশ্বাস্য।"

ব্যোমকেশ বললেন, "তা হলে আর দেরি নয়। দুর্গা বলে রওনা দেওয়া যাক।"

সকলে চোরাবালির সীমানায় এসে দাঁড়ালেন। ব্যোমকেশবাবু ধুতিটা একটু ওপরে তুলে বললেন, "তা হলে নামা যাক।"

জয়ধ্বনি বললেন, "ধুতি তুলছ কেন? জল পেরোবে নাকি?"

"তা বটে।" বলে ব্যোমকেশ ধুতি ফের নামিয়ে বললেন, "তা হলে চলুন।"

"তুমি আগে নামো।"

ব্যোমকেশ নামলেন, এবং চোখের পলকে কোমর অবধি হড়হড় করে চলে গেলেন বালির মধ্যে। শ্যাম লাহিড়ী সময়মত না ধরলে বাকিটাও যেত।

যখন টেনে তোলা হল, তখন ব্যোমকেশ ঘড়ি দেখে বললেন, "সর্বনাশ! এ যে রাত চারটে বেজে গেল! আর কতক্ষণই বা সময় পাওয়া যাবে?"

চারজনে ভাবিত হয়ে পড়লেন। লক্ষণ ভাল নয়।

জয়পতাকা সাহস করে চটিসমেত একটা পা একটু বাড়ালেন। চোখের পলকে চটিটা পা থেকে যেন ইচ্ছে করেই খসে বালির মধ্যে তলিয়ে গেল। জয়পতাকা পিছিয়ে এলেন ভয়ে। ওই সামান্য সুযোগে দ্বিতীয় চটিটা পা থেকে একটা ব্যাঙের মতো লাফ মেরে বালিতে অদৃশ্য হল।

জয়পতাকা বললেন, "যাঃ।"

শ্যাম লাহিড়ী বিষণ্ণ গলায় বললেন, "তার চেয়ে কেল্লায় চলো। ফিরে গিয়ে ভোরের অপেক্ষা করি। দিনের বেলা যাহোক ঠিক করা যাবে।"

এ-কথায় সকলে সায় দিয়ে কেল্লায় ফিরলেন। ডাইনিং হলের এঁটোকাঁটা সব যাদুমন্ত্রবলে পরিষ্কার হয়ে গেছে। সকলে বেশ অস্বস্তি নিয়েই বসে রইলেন। একটু ঢুলুনিও এল।

হঠাৎ জয়পতাকা চেঁচিয়ে উঠলেন, "এ কী?"

সবাই চমকে চেয়ে দেখল, কোথায় কেল্লা, আর কোথায় তার সাজানো ডাইনিং হল। সব ফক্কা। তাঁরা একটা ধ্বংসস্তুপের ওপর বসে আছেন।

বিস্ময়ে কেউ প্রথমটায় কথা বলতে পারল না। তারপর শ্যাম লাহিড়ী ব্যস্ত গলায় বললেন, "এরকম যে হবে তা আমার জানা ছিল। এখান থেকে আজ অবধি কেউ ফিরে যায়নি। কিন্তু বসে থাকলে তো চলবে না। চলো, উপায় একটা বের করতে হবে।"

ধ্বংসস্তুপের ইট-পাথর পার হতে বেশ কসরত করতে হল। ব্যোমকেশ ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিলেন বলে দু'বার আছাড় খেলেন।

ধ্বংসস্তুপের এক জায়গায় চারজনই থমকে দাঁড়ালেন। সেখানে উপুড় হয়ে একটা নরকঙ্কাল পড়ে আছে। হাত-দশেক দূরে আর-একটা।

জয়ধ্বনি শ্যাম লাহিড়ীকে বললেন, "ব্যাপারটা সুবিধের বুঝছি না। সবটাই দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে।"

"দুঃস্বপ্নই। তবে জ্যান্ত দুঃস্বপ্ন।"

চারদিকে ভোরের সুন্দর আলো ছড়িয়ে পড়েছে। একটু দূরে দেখা যাচ্ছে সবুজ বনভূমি। কিন্তু তাঁরা একটা চওড়া চোরাবালির মধ্যে কুৎসিত একটা ধ্বংসস্তুপে বন্দী।

শ্যাম লাহিড়ী হঠাৎ বললেন, "লক্ষ করেছ, পটাশগড়ে কোনও পাখিও আসে না!"

জয়ধ্বনি বললেন, " হ্যাঁ , জায়গাটা অস্বাভাবিক নিস্তব্ধ।"

শ্যাম লাহিড়ী কেল্লার চারদিককার ঝোপ-জঙ্গল, গাছপালা লক্ষ করলেন ঘুরে-ঘুরে। চেনা গাছ খুবই কম। জলের ব্যবস্থা নেই বললেই হয়। একটা পুরনো ইঁদারায় অনেক নিচে জল। তাও ওপরে থিকথিক করে ময়লা ভাসছে।

ব্যোমকেশ হঠাৎ বললেন, "একটা নৌকো পেলে হত।"

জয়ধ্বনি অবাক হয়ে বললেন, "নৌকো! নৌকো কেন?"

"নৌকো যখন জলে ভাসতে পারে, তখন বালিতে ভাসবে এ-আর বেশি কথা কী?"

"তা নৌকো পাবে কোথায়?"

"সেটাই ভাবছি।"

"ভাবো, কষে ভেবে ফ্যালো। মিটিং-এর এখনও ঢের দেরি।"

"আচ্ছা গাছপালা দিয়ে একটা ভেলা বানিয়ে নিলে মন্দ হয় না?"

"খুব হয়। চেষ্টা করে দ্যাখো।"

ব্যোমকেশ উদ্যোগী পুরুষ। সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেলেন। জয়পতাকা বিশুষ্ক মুখে তাঁকে সাহায্য করতে লাগলেন। যদিও তাঁর সন্দেহ হল, নৌকো বা ভেলা চোরাবালিতে ভাসবার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কিন্তু আশা জিনিসটাই ওরকম। যা অসম্ভব তাও মানুষ আশা করে।

শ্যাম লাহিড়ী আর জয়ধ্বনি একটু তফাতে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন।

জয়ধ্বনি বললেন, "দ্যাখো লাহিড়ী, বুড়ো হয়েছি। আমাদের দিন শেষ হয়ে এল। কিন্তু নাতিটা এমন বেঘোরে মরবে এটা যে সহ্য করতে পারছি না। আমার প্রাণ দিয়েও যদি ওকে বাঁচানো যায়।"

"প্রাণ তো এমনিতেও দিতে হবে, অমনিতেও দিতে হবে। কিন্তু প্রাণটা দিলেই তো আর বাঁচানো যাবে না। এখানকার গাছপালায় কোনও ফলটল দেখছি না। জল নেই। এভাবে দু-দিন বাঁচা যাবে হয়তো। তারপর ধুকতে ধুকতে মরতে হবে।"

"বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভাবতে হয়। এটা পুরনো কেল্লা, কোথাও সুড়ঙ্গ-টুড়ঙ্গও তো থাকতে পারে।'

"সেকথা আমিও ভেবেছি। কিন্তু থাকলেও সেটা এতদিনে বুজে যাওয়ার কথা। তাছাড়া এই বিশাল ধ্বংসস্তুপে সরিয়ে সুড়ঙ্গ বের করাও তো অসম্ভব ব্যাপার।"

"হাল ছেড়ে দিচ্ছ? মরতে যখন হবেই, তখন চলো, চেষ্টা করে দেখি।"

"আমার আপত্তি নেই। চলো।"

দুজনেই ধ্বংসস্তুপ, সরানোর কাজে লেগে গেলেন।

কিন্তু এই পরিশ্রমে এবং রাত জাগার ফলে চারজনেরই দুপুর নাগাদ সাঙ্ঘাতিক খিদে এবং তেষ্টা পেয়ে গেল। ধ্বংসস্তুপের নিচে এখনও কিছু খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর ভেলা একটা ডালপালা দিয়ে তৈরি প্রায় হয়েছে বটে, কিন্তু সেটার ছিরি দেখে কারও ভরসা হল না।

জয়পতাকা বয়সে তরুণ। তাঁর খিদেও বেশি। তিনি আর কিছু না বলে গাছের কয়েকটা পাতা চিবিয়ে নিলেন। তারপর ওয়াক থুঃ বলে ফেলে দিলেন। যম তেতো। বিশ্রী গন্ধ।

সবাই মিলে আরও কয়েকটা গাছের পাতা চিবোনোর চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু সুবিধে হল না।

শ্যাম লাহিড়ী বললেন, "কেউ বেশি কথাটথা বোলো না। বেশি কথা বললে তেষ্টা পায়। জলের বন্দোবস্ত নেই। কাজেই সাবধান হতে হবে।"

ব্যোমকেশ ভেলার বাঁধা-ছাঁদা একরকম শেষ করে বললেন, "তা হলে এটাকে ভাসানো যাক এবার। জয়ধ্বনিদা সবচেয়ে প্রবীণ মানুষ, উনিই আগে উঠুন।"

"কেন, আমাকে চোরাবালিতে ডুবিয়ে মেরে তোমার লাভ হবে কোন অষ্টরম্ভা? ওতে আমি উঠবার পাত্র নই। তুমি ওঠো গে।"

ব্যোমকেশ দমবার পাত্র নন। বললেন, "এবার একটা বৈঠা বা লগি দরকার। তা হলেই কেল্লা ফতে।"

লগির অভাব নেই। লম্বা একটা গাছের ডাল জোগাড় হয়ে গেল। তারপর ব্যোমকেশ ভেলাটা বালির দিকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে উঠে পড়লেন।

লগিটা ছিল বলে রক্ষা। কারণ, বালিতে পড়েই ভেলাটা ব্যোমকেশসহ অদৃশ্য হয়ে গেল। ব্যোমকেশের হাতে ধরা লগিটার ডগা শুধু উঁচু হয়ে ছিল। সেইটে চেপে ধরে শ্যাম লাহিড়ী পয়লা চোট সামলালেন। তারপর তিনজনে মিলে টেনে তুললেন ব্যোমকেশকে।

ব্যোমকেশ প্রাণে বেঁচেও কিছুক্ষণ জীবন্মৃতের মতো বসে রইলেন। সর্বাঙ্গে বালি। এমন কী তাঁর দাঁতেও বালি কিচকিচ করছে, চোখে বালি কচকচ করছে। এমনকী তিনি কিছুক্ষণ মিটিং-এর কথাও ভুলে গেলেন।

ক্রমে বেলা বাড়তে লাগল। খিদে এবং তেষ্টাও বাড়তে লাগল। তারপর দেখা গেল চারজনই ঝিমোচ্ছেন।

জয়ধ্বনি হঠাৎ ঝিমোতে-ঝিমোতে সোজা হয়ে উঠে বললেন, "লাহিড়ী!"

"বললা।"

"এভাবে হার মানা কি উচিত হবে?"

"কী করতে চাও?"

"চলো। চেষ্টা করি।"

"চলো", বলে শ্যাম লাহিড়ী উঠে পড়লেন।

দুজনে আবার ধ্বংসস্তূপ সরাতে লাগলেন। কিন্তু পণ্ডশ্রম বাড়তে লাগল। কিছুক্ষণ পরই দুজনই নেতিয়ে পড়লেন। হাঁফাতে লাগলেন।

বেলা গড়িয়ে বিকেল। তারপর সন্ধে। চারদিক অন্ধকার হয়ে এল।

ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর চারজন মাটিতে শুয়ে পড়লেন ক্লান্ত হয়ে। কারও মুখে কথা নেই।

ক্রমে রাত হল। রাত গভীর হল। চারজনই একটা ঘোরলাগা তন্দ্রার মধ্যে ঝিম মেরে পড়ে রইলেন। বুক ফেটে যাচ্ছে তেষ্টায়। পেট জ্বলে যাচ্ছে খিদেয়।

মাঝরাতে হঠাৎ ব্যোমকেশ তড়াক করে উঠে বসে বেশ চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "মানুষ কী করে নরমাংস খায় আমি জানি না। কিন্তু আমার এখন খেতে ইচ্ছে করছে।"

একথা শুনে জয়ধ্বনি তাড়াতাড়ি লাঠি বাগিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "খবর্দার, আমার নাতির দিকে নজর দেবে না।"

ব্যোমকেশ আবার শুয়ে পড়ে বললেন, "আমি ঠাট্টা করলুম।"

"এই অবস্থায় কারও আবার ঠাট্টাও আসে নাকি? তোমার মতলব আমি বুঝেছি। যদি তেরিমেরি করো, তা হলে তিনজনে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গিয়ে তোমাকে বালিতে ফেলে দেব।"

ব্যোমকেশ আর কথা বললেন না। গুনগুন করে একটু গান গাওয়ার চেষ্টা করে ব্যাপারটাকে হালকা করতে চাইলেন বোধহয়। কিন্তু সুরটা গলায় খেলাল না।

ফের ভোর হল। কিন্তু চারজনের কারওই আর উঠে বসবার মতো অবস্থা নেই। খিদের চেয়েও তেষ্টা প্রবল। শ্যাম লাহিড়ী উঠে কাঁপতে কাঁপতে ইঁদারার ধারে গিয়ে উঁকি দিয়ে বললেন, "বালতি আর দড়ি থাকলে ওই জলই খানিকটা খেতাম।"

ক্রমে বেলা বাড়ল। চারজন আজ আর উঠলেন না। পড়ে রইলেন মাটিতে। শ্বাসের কষ্ট হচ্ছে। শরীরে আর এক রত্তি জোর নেই। মাঝে মাঝে এক-একজন "জল জল" বলে কাতরে উঠছেন।

বেলা গড়াতে লাগল। বিকেল হল। ফের রাত্রি ঘনিয়ে এল।

প্রথমে জয়ধ্বনি, তারপর ব্যোমকেশ তারপর জয়পতাকা মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। শ্যাম লাহিড়ীর জ্ঞানটা লুপ্ত হল না। কিন্তু তিনিও বেশিক্ষণ লড়তে পারবেন বলে তাঁর মনে হল না।

রাত্রি গভীর হল।

ইকোয়েশনটা করে যাচ্ছে তো করেই যাচ্ছে ভুতু। শেষ আর হয় না। পাতার পর পাতা সে একটা অঙ্কই করে চলেছে। প্রতি পদক্ষেপেই নতুন নতুন মোড় ফিরছে অঙ্কটা। এসে যাচ্ছে নানা নতুন সংখ্যা, নতুন সঙ্কেত। কিন্তু ক্রমে-ক্রমে বীজাকার ইকোয়েশন পরিণত হচ্ছে মহীরূপে। মস্ত মোটা প্যাডের পাতা ক্রমে-ক্রমে ফুরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অঙ্কটা বেড়ে যাচ্ছে তো বেড়েই যাচ্ছে।

ভুতুর কোনওদিকে খেয়াল নেই। তার মাথা চমৎকার খেলছে। অঙ্কের মধ্যে ডুবে গেছে সে। একসময়ে অঙ্কটাকে সে যেন অনুভব করতে পারল, অর্থাৎ তার মনে হল, এটা শুধু অঙ্কই নয়। অঙ্ক যেন এক ব্যক্তি, তার আলাদা সত্তা আছে, শরীর আছে।

কোথা দিয়ে রাত গেল, কোথা দিয়ে দিন, তা বুঝতে পারল না ভুতু। তেষ্টা পেলেই সে শুধু বলে "জল!"

অমনি কোথা থেকে জল এসে যায়।

খিদে পেলেই সে বলে, "খাবার।"

অমনি খাবার এসে যায়।

ভুতু কোনওদিকে তাকায় না। একমনে অঙ্ক কষতে থাকে। কষতে কষতে প্যাডের পাতা শেষ হয়ে এল। একদম শেষ পাতায় চলে এল ভুতু।

কিন্তু অঙ্কটা কি শেষ হবে, ভুতুর মনে হচ্ছে, আরও বহুদূর গড়াবে অঙ্কটা।

কিন্তু প্যাডের শেষ পাতাটা যেই শেষ হল, অমনি সে বুঝতে পারল, তার চারদিকে সেই ঘেরাটোপ নেমে এসেছে। তার মাথার ভিতরে কেউ বার্তা পাঠাচ্ছে।

ভুতু কলম থামিয়ে উৎকর্ণ হল।

“আমি সংখ্যা। কী চাও?”

“অঙ্কটা কি হয়েছে?”

“অঙ্কটার কোনও শেষ নেই। যত কষবে তত বড় হতে থাকবে।”

“তা হলে কী হবে? প্যাডের পাতা যে শেষ হয়ে গেল!”

“তাতে কি? অঙ্কটা প্রাণ পেয়েছে। বাকিটা সে নিজেই করবে। করে যাবে।”

“কোথায় শেষ হবে?”

“শেষ বলে কিছু নেই। হয়ে চলবে। হতে থাকবে। ঠিক এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মতো। অসীমের মতো।”

“কিন্তু আলফাবেট-সাহেব বলেছিলেন...”

“জানি। সাহেব বলেছিলেন, ইকোয়েশনটা করতে পারলে তুমি নিউমারেলসের নাগাল পাবে।”

“হ্যাঁ তাই।”

“আমি এসেছি।”

“আমি এই কেল্লার রহস্য ভাঙতে চাই।”

“পারবে না।”

“বালিতে কার পায়ের ছাপ পড়েছিল?”

“অবান্তর প্রশ্ন। এখানে যা কিছু ঘটে তার লৌকিক ব্যাখ্যা নেই। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। সে তুমি বুঝবে না।”

“জয়পতাকাবাবুর কী হবে?”

“তিনি মৃত্যুর কাছাকাছি।”

“আমি তাঁদের ফিরিয়ে নিতে চাই।”

“তাঁরা অন্য তরঙ্গে রয়েছেন। দেখা হবে না।”

“আমি তাঁদের তরঙ্গে ঢুকতে চাই।”

“তা হলে তোমারও ওই দশা হবে। তরঙ্গ বদলালে আর আমাদের সাহায্য পাবে না।”

“চোরাবালির মধ্যে পথ আছে, আমি জানি।”

“আছে। সরু পথ। সে পথ ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরে যায়।”

“ঠিক ঘড়ির কাঁটার মতো?”

নিউমারেলস প্রথমে জবাব দিল না। তারপর বলল, “হ্যাঁ মিনিটের কাঁটা।”

“এখন ক’টা বাজে?”

“রাত বারোটা বাজতে দু’মিনিট বাকি।”

“এখন পথটা কোথায় আছে?”

“উত্তর তীরচিহ্নের বরাবর। প্রতি দশ মিনিটে ওখানে ঘুরে আসছে।”

“আমি একটা ঘড়ি চাই।”

“তুমি বুদ্ধিমান।”

“ঘড়িটা দিন।”

“ঘড়িটা তোমার কব্‌জিতে বাঁধা হয়ে গেছে। দ্যাখো।”

ভুতু অবাক হয়ে দেখল, বাস্তবিকই তার বাঁ হাতের কবজিতে একটা ঘড়ি। বারোটা বাজতে দেড় মিনিট বাকি।

“আমার ফ্রিকোয়েন্সি পালটে দিন।”

“দিচ্ছি। তার আগে একটা কথা।”

“কী কথা?”

“যদি তরঙ্গ না বদলাও তবে তুমি এখানে রাজার মতো থাকতে পারো। তোমার ইচ্ছা সবসময়ে পূর্ণ হবে। এত সুখ ছেড়ে যেতে চাও কেন?”

“আমি একটা অন্যায় করেছিলাম। তার প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে।”

“জানি। ঠিক আছে, তোমার তরঙ্গ পালটে দিচ্ছি।”

ঘরের আলোটা হঠাৎ নিভে গেল। চারদিকে একটা ঝিঁঝির মতো শব্দ। তারপরই ভুতু পড়ে গেল মাটিতে। টেবিল-চেয়ার উধাও হয়েছে।

ভুতু টের পেল, সে একটা ভাঙাচোরা গহ্বরের মধ্যে পড়ে আছে। হামাগুড়ি দিয়ে সে বেরিয়ে এল। তারপর ধীর পায়ে ঢালু বেয়ে উঠল। সামনেই অন্ধকার কেল্লার ধ্বংসস্তুপ। ভুতু কিছুক্ষণ বিষন্ন চোখে চেয়ে রইল।

বেশি খুঁজতে হল না। ঝোপজঙ্গলের মধ্যে চারজন শুয়ে আছে। জ্ঞান নেই। শক্তি নেই।

“শ্যামদাদু! শ্যামদাদু?”

ভুতু জানে একমাত্র শ্যামদাদুই শক্ত লোক।

শ্যাম লাহিড়ী চোখ মেলে বলেন, “কে?”

“আমি ভুতু। উঠুন। আমি আপনাদের নিতে এসেছি।”

ব্যোমকেশ আতঙ্কিত গলায় খোনা সুরে বললেন, “ভূত! আমাদের নিতে এয়েছ! কেন বাবা?”

“ভূত নই। ভুতু।”

শ্যাম লাহিড়ী উঠে বসলেন। অতি কষ্টে। বললেন, “কী ভাবে এলি?”

“পরে বলব। উঠুন।”

ধীরে-ধীরে অবশ মৃতপ্রায় দুর্বল শরীরে সকলেই উঠে বসল। প্রাণের মায়া বড় মায়া।

ভুতু বলল, “খুব সাবধানে আমার পিছু পিছু আসুন।”

জয়ধ্বনি বললেন, “পারবি তো?”

“পারব। কিন্তু পথটা খুব সরু। একটু এদিক-ওদিক হলেই কিন্তু তলিয়ে যেতে হবে।”

উত্তর তীরচিহ্ন কোথায় তা ভুতু জানে না। কিন্তু সে জানে ঠিক বের করবে। তার আত্মবিশ্বাস প্রচণ্ড।

উত্তর দিকে কিছু দূরে এগোল ভুতু। হঠাৎ চোখে পড়ল, চোরাবালির একটা জায়গায় একটা পাথরের টুকরো পড়ে আছে। জ্যোৎস্নায় দেখা গেল সেটার গায়ে তীরের মতো কিছু আঁকা। আশ্চর্যের ব্যাপার, পাথরের গায়ে খোদাই করা তীরচিহ্ন ধীরে ধীরে ঘুরে যাচ্ছে। তীরটা একপাক ঘুরে বালিয়াড়ির দিকে মুখ ফেরাল। ভুতু দেখল, তার হাতঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তীরটা কাঁটায়-কাঁটায় মেলানো।

“আসুন।” বলে ভুতু বালিতে পা রাখল। চোখ ঘড়ির দিকে। সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে পথটা সরে যাচ্ছে বাঁ থেকে ডাইনে। সরু পথ। প্রতি পদক্ষেপে তাকে হিসেব করতে হচ্ছে। -

ব্যোমকেশ একটু পিছিয়ে পড়ায় একটা পা বালিতে গেঁথে গেল। ভুতু চেঁচিয়ে বলল, “সাবধান।”

ব্যোমকেশ প্রায় সাষ্টাঙ্গ হয়ে জয়ধ্বনির কোমর ধরে উঠে পড়ল।

“কেমন বেকুব হে! এই অবস্থায় কেউ কাউকে সাপটে ধরে?”

ঝগড়া লাগলে দুজনেরই বিপদ। পথ সরে যাচ্ছে। ভুতু বলল “সাবধান। একেবারে আমার পায়ে-পায়ে আসুন।”

সবাই নীরবে ভুতুকে অনুসরণ করতে লাগল। বাঁ থেকে ডাইনে ঘুরে কোণাকুণি ভুতু এগোতে লাগল ঘড়ি ধরে। প্রত্যেক পদক্ষেপে অঙ্ক আর জ্যামিতি মেলাতে মেলাতেও।

দশ মিনিট পর তাঁরা সবাই ভুতুর পিছু পিছু ডাঙাজমিতে উঠে এলেন।

ব্যোমকেশ পরিশ্রমে বসে পড়লেন। তারপর শুয়ে পড়ার উপক্রম করলেন।

জয়ধ্বনি শুধু বললেন, “মিটিং! মিটিং! দেরি হয়ে যাবে।”

ব্যোমকেশ সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন, “তাই তো! মিটিং আছে ভুলে গিয়েছিলাম। চলুন চলুন, দেরি করা ঠিক হবে না।”

ভুতু একবার কেল্লার দিকে ফিরে তাকাল। দেখল, কেল্লা নেই। বনভূমি বিস্তার লাভ করছে। ভুতু ফিসফিস করে বলল, “তরঙ্গ পালটে গেল। হয়তো আর কোনওদিনই কেল্লাটাকে দেখা যাবে না।”

দিন-সাতেক বাদে ক্লাসে একটা শক্ত অঙ্ক দিলেন জয়পতাকা।

ভুতু অঙ্কটা কষে যখন জয়পতাকার কাছে নিয়ে গেল, জয়পতাকা ঘ্যাঁচ করে কেটে দিয়ে বললেন, “হয়নি, কেন যে অঙ্কে তুই এত কাচা!”

ভুতু মাথা চুলকোতে চুলকোতে জায়গায় ফিরে গেল। “নাঃ, অঙ্কই আমাকে ডোবাবে দেখছি!”

পটাশগড়ের জঙ্গলে • শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

॥ ই-বুকটি সমাপ্ত হল ॥

www.anandapub.in